

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত

প্রতিবেদন

প্রকল্পের শিরোনাম

বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

Art Direction in Bangladeshi Film: Past, Present and Future

গবেষক/প্রকল্প পরিচালক

মো. আব্দুল করিম

সহকারী অধ্যাপক

ফিল্ম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২০২৪

গবেষণা সার-সংক্ষেপ

বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখার সম্মিলিত কলা-কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এক বিস্ময়কর শিল্প মাধ্যম চলচ্চিত্র কয়েকশত বছর পেরিয়ে আজ ‘আধুনিক’ ও ‘সাম্প্রতিক’ মাধ্যম। শতবর্ষী এ শিল্প মাধ্যমটি একটি যৌথশিল্প। অনেকের সমবেত প্রচেষ্টায় একটি সিনেমা নির্মিত হয়। এই সিনেমার প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দৃশ্যমানতা। আর এই দৃশ্যমানতার সার্বিক সাফল্যটি নির্ভর করে ভালো প্রোডাকশন ডিজাইন বা শিল্প নির্দেশনার উপর। এই গবেষণাটি একটি ইতিহাসভিত্তিক গুণগত গবেষণা, যেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা। তথ্য আহরণ ও বিশ্লেষণে সাহিত্য পর্যালোচনা, টেক্সচুয়াল অ্যানালাইসিস, বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। গবেষণার নমুনা নির্বাচনে সম্ভাবনা ও নিঃসম্ভাবনা উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে; এর মধ্যে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত ৩৭টি চলচ্চিত্র থেকে প্রতিটি দশককে প্রতিনিধিত্বকারী ছয়টি চলচ্চিত্র – ডুমুরের ফুল (১৯৭৮), শুভদা (১৯৮৬), অন্ধ বিশ্বাস (১৯৯২), মনের মানুষ (২০১০), গোর (২০২০) এবং নোনাজলের কাব্য (২০২১) উদ্দেশ্যগতভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। পাশাপাশি স্বাধীনতার পর চলচ্চিত্রে অবদান রাখা ছয়জন স্বনামধন্য শিল্প নির্দেশকের – আবদুস সবুর, তরুণ ঘোষ, উত্তম গুহ, মো. কলমতর, শিহাব নূরুন নবী ও হিমাদ্রি বড়ুয়া সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষণা ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে ১৫ জন শিল্প নির্দেশক জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন ৩৭টি চলচ্চিত্রে, যেখানে সাহিত্যভিত্তিক, ঐতিহাসিক, বাণিজ্যিক ও পরিবেশ নির্ভর কাহিনিতে বাস্তবধর্মী, প্রতীকধর্মী ও কল্পনা-বাস্তব মিশ্র ধারার ও বৈশিষ্ট্যের শিল্প নির্দেশনা দেখা যায়। সিজিআই, গ্রিনস্ক্রিন ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার শিল্প নির্দেশনায় বৈচিত্র্য এনেছে। হাসান আলী, মহিউদ্দিন ফারুক এবং উত্তম গুহ এবং শিহাব নূরুন নবী প্রভৃতি শিল্প নির্দেশকরা বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তবে সীমিত বাজেট, প্রযুক্তিগত ঘাটতি ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব শিল্প নির্দেশনার বড় চ্যালেঞ্জ, যা অতিক্রমে সমন্বিত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ প্রয়োজন।

চাবিশব্দ: বাংলাদেশি চলচ্চিত্র, শিল্প নির্দেশনা, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণাটি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে পরিচালিত হয়েছে।
গবেষণা পরিচালনায় অর্থের যোগান দিয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করায় অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

১. ভূমিকা	৬-৭
১.১. গবেষণা সমস্যা/গবেষণা প্রেক্ষাপট	৭
১.২. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৮
১.৩. গবেষণা জিজ্ঞাসা	৮
১.৪. গবেষণার যৌক্তিকতা	৮-৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. পূর্বপাঠ পর্যালোচনা ও তাত্ত্বিক কাঠামো	
২.১. সাহিত্য পর্যালোচনা	৯-১৬
২.২. তাত্ত্বিক কাঠামো	১৭-১৮

তৃতীয় অধ্যায়

৩. গবেষণা পদ্ধতি	
৩.১. গবেষণার প্রকৃতি	১৮
৩.২. নমুনায়ন/নমুনা সমগ্রক	১৮-১৯
৩.২.১. চলচ্চিত্রের নমুনায়ন	১৯
৩.২.২. পেশাজীবীদের নমুনায়ন	১৯
৩.৩. তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ	১৯-২০
৩.৪. উপাত্ত বিশ্লেষণ	২০

চতুর্থ অধ্যায়

৪. গবেষণা তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	
৪.১. নির্বাচিত চলচ্চিত্রের আধেয় উপস্থাপন	২০-৬৯
৪.২. সংগৃহীত সাক্ষাৎকারের তথ্য উপস্থাপন	৬৯-৭০

পঞ্চম অধ্যায়

৫. ফলাফল উপস্থাপন ও পর্যবেক্ষণ	
৫.১. শিল্প নির্দেশনার প্রারম্ভিকতা	৭০-৭২

৫.২.	অগ্রগামী শিল্পী ও তাদের অগ্রণী ভূমিকা	৭২-৭৮
৫.৩.	শিল্প নির্দেশনার কালক্রমের ধারা ও বৈশিষ্ট্য	৭৭-৭৮
৫.৪.	শিল্প নির্দেশনার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	৭৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.	উপসংহার ও সীমাবদ্ধতা:	৭৯-৮০
	গ্রন্থপুঞ্জি	৮০-৮২

১. ভূমিকা

চলচ্চিত্রে যে ঘটনাগুলো ঘটবে তার পশ্চাৎপটের দৈহিক অবয়ব তৈরি করা শিল্প নির্দেশনার প্রথম কাজ। এই দৈহিক অবয়বকেই বলা হয় সেট। তার মধ্যেই কলাকুশলীরা অভিনয় করেন। তাই গল্পের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থান-কাল-পাত্রের সার্বিক অবস্থানের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এই দৈহিক অবয়ব তৈরি করতে হয়। যা দর্শক শ্রোতার কাছে বাস্তব মনে হয়। আমরা চলচ্চিত্রে যে দৃশ্যপট দেখি তার মধ্যে দুটি পটভূমি থাকে- সামনের এবং পিছনের। সামনে দেখি চরিত্রকে যাকে বলা হয় সাবজেক্ট এবং তার পেছনে অভিনয়ের স্থান হিসেবে যে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় সেটা হচ্ছে অবজেক্ট। অবজেক্ট বা দৃশ্যপটটি নির্মাণ করায় শিল্প নির্দেশকের কাজ। অত্যাং চিত্রনাট্য বর্ণিত স্থান-কাল পাত্রকে সুনিপুণ, শৈল্পিক, ও নান্দনিক বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলায় শিল্প নির্দেশনার কাজ।

Art direction in film refers to the visual and design aspects of a movie. It involves the overall look and feel of the film, including the sets, props, costumes, and overall visual style. The art director works closely with the director and production designer to create the visual concept for the film and ensures that the artistic and visual elements align with the overall creative vision.

সুতরাং শিল্প নির্দেশনা হলো অভিনয়তব্য একটা দৃশ্যের জন্য নির্মিত এমন একটা দৃশ্যপট বা পটভূমি যা ঐ দৃশ্যের মেজাজের সঙ্গে মানানসই; যা আলোকসম্পাদনের ক্ষেত্রে, ক্যামেরা মুভমেন্টের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেবে না, যা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়কর্ম সম্পাদনে সহায়ক হবে এবং নাটকীয় মুহূর্তগুলো বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করবে। একটি চিত্রনাট্যের মেজাজ ও চলচ্চিত্রের পরিচালকের মনোপুত করে দৃশ্যপট নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেননা এই দৃশ্যগত অবয়বই দর্শক শ্রোতার কাছে একটি গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য করতে সহযোগিতা করে। চলচ্চিত্র নির্মাণ একটি যৌথকর্ম মাধ্যম। শিল্প নির্দেশনায় বোধ হয় এই যৌথ কর্মের পরিমাণ বেশি। কারণ অনেকগুলো মানুষের শ্রমের কল্যাণেই একটি চলচ্চিত্রের বাস্তব পরিবেশ তৈরি হয় যা সমাজ-সংস্কৃতির সাপেক্ষে মানুষ সমাজের দর্পণ হিসেবে সেই চলচ্চিত্রকে ভাবতে থাকে।

সিনেমায় শিল্প নির্দেশনার গুরুত্ব সম্পর্কে ইতালীয় চলচ্চিত্র পরিচালক ফেদেরেকো ফেলিনি বলেন, “সিট বা সিন ডিজাইনারের সঙ্গে সহযোগিতা আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। আমার চলচ্চিত্রের শিল্প-নির্দেশকের ও আমার প্রাথমিক রুচি এক হওয়ায় আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া আছে। চিত্রনাট্যের আগেই তার সাথে প্রত্যহ যোগাযোগ রাখি কারণ ছবিটাকে আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখে নিতে চায় একবার। সেই মুহূর্ত থেকে, ছবিটাকে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে আমাদের দৃষ্ট মানুষ ও অঞ্চল, পরিবেশ, আর পটভূমি এইভাবে তৈরি হয়ে যায়। তখন থেকেই তৈরি হয়ে থাকে। চরিত্রের সঙ্গে অবস্থার স্বতঃস্ফূর্ত যোগাযোগেই একটি দৃশ্য অর্থবহ হয়ে ওঠে। পাতার পর পাতার সংলাপ লিখলেন, তারপর শিল্প নির্দেশকের সঙ্গে আলোচনা করে এমন একটা ঘর বানালেন যে ঘরের মধ্য দিয়েই সব বলা যায়। তখন উপবলক্কি করবেন সংলাপ ছাড়াই আপনি এই বক্তব্য আরও প্রত্যক্ষ, বোধগম্য ও সঠিকভাবে পেশ করা যায়।”

চলচ্চিত্রে গল্পের স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী দৈহিক অবয়ব (সেট) তৈরি করাই শিল্প নির্দেশনার মূল কাজ। দর্শক যেন দৃশ্যপটকে বাস্তব মনে করে, সে জন্য নান্দনিক ও শৈল্পিকভাবে পরিবেশ নির্মাণ করাও শিল্প নির্দেশনার দায়িত্ব। চিত্রনাট্যানুসারে চরিত্র, অভিনয়, ক্যামেরা মুভমেন্ট এবং আলোকসম্পাদন যেন স্বাভাবিকভাবে সম্পাদিত হতে পারে, এমনভাবে দৃশ্যপট সাজানো বা সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা। শিল্প নির্দেশনা একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল যেখানে সেট ডিজাইনার, পরিচালক, কারিগরি কর্মীসহ অনেকের অবদান থাকে। সুতরাং তাদের সম্মনয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হয়। নাটকীয় পরিস্থিতিতে দর্শকের কাছে বোধগম্য, বিশ্বাসযোগ্য ও শক্তিশালী করে তুলতে শিল্প নির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিচালকের সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন শিল্প নির্দেশক পরিচালক ও প্রোডাকশন ডিজাইনারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলচ্চিত্রের সামগ্রিক ভিজুয়াল রূপ গড়ে তোলেন। সংলাপের বিকল্প প্রকাশভঙ্গি ফেলিনির মতে, শিল্প নির্দেশনা অনেক সময় সংলাপ ছাড়াই একটি দৃশ্যের বক্তব্য স্পষ্ট ও গভীরভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম। নির্মিত পরিবেশ সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থেকে চলচ্চিত্রকে মানুষের বাস্তব জীবনের দর্পণ হিসেবে উপস্থাপন করে। শিল্প নির্দেশনা কেবল দৃশ্য নির্মাণ নয়, বরং গল্পকে দৃশ্যমান বাস্তবতায় রূপান্তরিত করার শিল্প।

১.১. গবেষণার প্রেক্ষাপট/সমস্যা: বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখার সম্মিলিত কলা-কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এক বিস্ময়কর শিল্প মাধ্যম চলচ্চিত্র কয়েকশত বছর পেরিয়ে আজ ‘আধুনিক’ ও ‘সাম্প্রতিক’ মাধ্যম। শতবর্ষী এ শিল্প মাধ্যমটি একটি যৌথশিল্প। অনেকের সমবেত প্রচেষ্টায় একটি সিনেমা নির্মিত হয়। এই সিনেমার প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দৃশ্যমানতা। আর এই দৃশ্যমানতার সার্বিক সাফল্যটি নির্ভর করে ভালো প্রোডাকশন ডিজাইন তথা শিল্প নির্দেশনার ওপর। চলচ্চিত্র শিল্পে ‘প্রতিষ্ঠান’ নামে খ্যাত ভারতীয় পরিচালক সত্যজিৎ রায় শিল্প নির্দেশনা সম্পর্কে বলেন, কাহিনীর ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে যা সাহায্য করবে, বক্তব্যকে যা পরিস্ফুট করবে – তাই শিল্পসম্মত। চলচ্চিত্রে নায়কের ঘরের সামগ্রিক চেহারা যদি চিত্রনাট্যের এই বিশেষ চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা না করে, তবে সেই ঘর যতই সুদৃশ্য বা সুনির্মিত হোক, শিল্প হিসেবে তার কোন মূল্য নেই।

চলচ্চিত্রে অভিনয়তব্য দৃশ্যের জন্য গল্পের মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে দৃশ্যপট বা পটভূমি তৈরি হয় তা নিয়ে বাংলাদেশে নিবিড় কোন কাজ হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশে শিল্প নির্দেশনা নিয়ে এখন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আলোচনা হয়। বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কবে থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুষঙ্গ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয় তার কোন বিস্তারিত ইতিহাস রচিত হয়নি। শিল্প নির্দেশনা নিয়ে প্রাথমিক টুকটাকি আলাপ থাকলেও বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে শিল্প নির্দেশনার যে ধারার বিবর্তন হয়েছে তার সম্পর্কেও খুব বেশি জানা যায়নি। বলা হয় চলচ্চিত্র নির্মাণে অনেক শিল্পী-কারিগরের যৌথ ভূমিকা থাকে কিন্তু একক বিভাগ হিসেবে শিল্প নির্দেশনায় সবচেয়ে বেশি লোকবল কাজ করে। চিত্রনাট্যের স্থান-কাল-পাত্র ও পাত্র-পাত্রীর আয়-ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার কাজ করতে কেমন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় এবং সময়ের পরিক্রমায় ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় শিল্প নির্দেশনার ভবিষ্যতের রূপরেখা কেমন হবে তা সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

১.২. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

‘বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটির সাধারণ উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে নির্মিত চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার বিবর্তনের ইতিহাস ও স্বরূপ অন্বেষণ করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:

গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্যের উত্তর ভিত্তি করে আরও কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হবে। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার বিবর্তনের ইতিহাস অনুসন্ধান;
২. বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার ধারা চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণ;
৩. বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার বর্তমান প্রবণতার স্বরূপ উন্মোচন;
৪. বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা যাচাই করা।

১.৩. গবেষণা জিজ্ঞাসা:

প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটি উদ্দেশ্যের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যেও পরিচালিত হবে। নিম্নে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের নমুনা উল্লেখ করা হলো।

- ক. বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনায় অগ্রগামী শিল্পী এবং শিল্পের বিকাশে তাদের ভূমিকা কী?
- খ. নান্দনিকতা, কৌশল ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দশকে বাংলাদেশে শিল্প নির্দেশনা কীভাবে বিকশিত হয়েছে?
- গ. বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার বর্তমান প্রবণতা ও অনুশীলনগুলো কী কী?
- ঘ. বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনায় কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় এবং উত্তরণের উপায় কী?

১.৪. গবেষণার যৌক্তিকতা:

চলচ্চিত্র একটি যৌথ শিল্প কর্ম যেখানে সাহিত্য, সংগীত, নাটক, চিত্রকলা, চিত্রশিল্প ইত্যাদি শিল্পের সংমিশ্রণ ঘটে। চলচ্চিত্র একটি চিত্রনাট্য নির্ভর কর্ম। সেই চিত্রনাট্যকে ভিজুয়াল রূপদান ই চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রের ভিজুয়াল রূপদান করতে চিত্রনাট্য অনুসারে একটি পশ্চাৎপটভূমির প্রয়োজন। এই পশ্চাৎপট টি একটি চিত্রশিল্পের চারকোনা ক্যানভাস থেকে উৎসারিত। চিত্রশিল্পীগণ বলে থাকেন, আমরা যখন ছবি আঁকি, তখন একটা চারকোনা ফ্রেমের ক্যানভাসকে পটভূমি হিসেবে নিই, সেখানে কম্পোজিশন, ফর্ম, স্পেসের সমবণ্টন, টেক্সচার এবং রং নিয়ে ভেবেচিন্তে ছবিটা আঁকি। ঠিক তেমনি ক্যামেরায় যখন লুক থ্রো করা হয়, তখন একটা চারকোনা ফ্রেমই দেখা যায়। প্রতিটা ফ্রেমকেই একটি পেইন্টিং মনে করে শিল্প নির্দেশনা দিতে হয়। পার্থক্য শুধু পেইন্টিং হয় পেইন্টারের নিজের

মন থেকে আর চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনা দিতে হয় চিত্রনাট্য অনুসারে। চিত্রনাট্য অনাসারে চলচ্চিত্রের এই পশ্চাৎপট বিনির্মাণে শিল্প নির্দেশক যে ভূমিকা বা শিল্পকর্ম তা নিয়ে বহির্বিষয়ে বিস্তারিত ক্জ হলেও বাংলাদেশে তা অপ্রতুল। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার ইতিহাস কী, অগ্রণী ভূমিকা কারা রেখে গিয়েছেন তা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে বাংলাদেশে অনেক শিল্প নির্দেশক চলচ্চিত্রে কাজ করে যাচ্ছেন এবং তাদের কাজের জন্য চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু তাদের এ কাজে শিল্প নির্দেশনার ধারা বা প্রবণতা কেমন ছিল বা এখন কিরূপ ধারা প্রচলিত আছে বা ভবিষ্যতে সেই ধারা কেমন হতে পারে কিংবা শিল্প নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য বা ফেক্টরগুলো কতটা ফুটিয়ে তুলেছেন তার সম্পর্কে গভীর কোন কাজ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি। পত্রিকা বা টেলিভিশনে শিল্প নির্দেশকগণ তাদের কাজের জন্য শিল্প নির্দেশক ক্যাটাগরিতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার খবর বের হয়। আবার কখনো কখনো তাদের কাজ নিয়ে টুকিটাকি সংবাদ প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়। অন্যদিকে শিল্প নির্দেশনা কী, শিল্প নির্দেশনা কীভাবে দিতে হয় তা সম্পর্কে প্রথমিক কিছু তথ্য জানা যায় কিছু বইয়ের অধ্যায় থেকে। কিন্তু শিল্প নির্দেশনার অতীত ইতিহাস, বর্তমান প্রবণতা প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। সুতরাং প্রস্তাবিত গবেষণাটি শিল্প নির্দেশনা নিয়ে জানার যে শূন্যতা রয়েছে তা অনেকটা পূরণ করবে বলে আশা করা যায়।

২. পূর্বপাঠ পর্যালোচনা ও তাত্ত্বিক কাঠামো

২.১. প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যালোচনা

চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা একটি সৃজনশীল শাখা যেখানে চলচ্চিত্রে গল্পের প্রেক্ষাপটে পশ্চাৎপট নির্মাণে দায়িত্ব পালন কও শিল্প নির্দেশনা নামক একটি বিভাগ। এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হলো চিত্রনাট্যানুসারে সেট, লোকেশন, প্রপস, কস্টিউম, রঙ এবং স্থানিক নকশা, যা সিনেমাটোগ্রাফির সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করে। শিল্প নির্দেশক বা প্রোডাকশন ডিজাইনার নিশ্চিত করেন যে চলচ্চিত্রের ভিজুয়াল পরিবেশ গল্পকে সমর্থন করে, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে প্রফলিত করে এবং দর্শকের আবেগগত বিষয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। শিল্প নির্দেশক শব্দটি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। প্রাথমিক স্টুডিও নির্ভর চলচ্চিত্র যুগে এটি শিল্প বিভাগ প্রধানকে বোঝাত। আজ প্রোডাকশন ডিজাইনারকে চলচ্চিত্রের পূর্ণাঙ্গ ভিজুয়াল রূপকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সুতরাং একটি চিত্রনাট্য বা গল্পকে দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে উপস্থাপন করতে যা বিশেষ ভূমিকা রাখে তা হলো শিল্প নির্দেশনা বা প্রোডাকশন ডিজাইন। গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বিশ্ব চলচ্চিত্রে ১৯১৪ সাল থেকেই শিল্প নির্দেশনা বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়ে আসছে। মিচায়েল রিজু রচিত *আর্ট ডিরেকশন ফর ফিল্ম* (২০০৫) গ্রন্থে বলা হয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম সৃজনশীল নির্মাতা হিসেবে উইলফ্রেড বাকল্যান্ডকে 'শিল্প পরিচালক বা আর্ট ডাইরেক্টর' নামে ভূষিত করা হয়। বাকল্যান্ডের তাঁর এই সৃষ্টিশীল কাজ ১৯১৪ সাল থেকেই শুরু করেন। অন্য একটি গ্রন্থ *দি ফিল্ম মেকার্স গাইড টু প্রোডাকশন ডিজাইন* (২০০২) তে ভিনসেন্ট লোব্রাটো বলেন, বিশ্বের প্রথম দিকের চলচ্চিত্রগুলোতে শিল্প নির্দেশনার ধারণাটি প্রয়োগ করা হয়নি। কিন্তু ১৯২০ ও ১৯৩০ এর দশকের হলিউড চলচ্চিত্রগুলোতে শিল্প নির্দেশনা ধারণাটি প্রয়োগ হতে শুরু হলে সেটা অনেকটা পূর্ণতা পায় ১৯৩৯ সালের *গন উইথ দি উইন্ড* চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে। এই সিনেমার

শিল্প নির্দেশক উইলিয়াম ক্যামেরুন মেনজিসকে বিশ্ব চলচ্চিত্রে অগ্রগামী শিল্প নির্দেশক বলা হয়। ইতিহাসের আলোকে শিল্প নির্দেশনার ধারা সমূহ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা হলো।

নির্বাক যুগে চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনা

চলচ্চিত্রের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৮৯৫-১৯২০ সাল পর্যন্ত সময়কে নির্বাক যুগ বলা হয়। এই যুগে চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা বলতে নাটকের শিল্প নির্দেশনার মতো শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড রঙিন করা বা মঞ্চনাট্যের শৈলীর মতো দৃশ্যাবলী ব্যবহৃত হতো। কিন্তু ধীরে ধীরে বাস্তব ভিত্তিক ও নিমজ্জিত পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা শুরু হয়। যেখানে শিল্প নির্দেশনার মূল কাজ হলো সিনেমাকে দর্শকের কাছে বাস্তব বলে বিশ্বাস করানো। এই ক্ষেত্রে শিল্প নির্দেশনা প্রধান ভূমিকা পালন করে। সিনেমায় জাদুকরী ভাবনা নিয়ে প্রথম যিনি সামনে আসেন তিনি হলেন জর্জ মিলিয়ে। তিনি একাধারে জাদুকর ও সেট ডিজাইনার। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে চলচ্চিত্রের অসীম সম্ভাবনা। তাঁর চলচ্চিত্র *এ ট্রিপ টু দা মুন* (১৯২০) এ ব্যবহৃত অলঙ্কৃত ও কল্পনাপ্রবণ সেট চলচ্চিত্রকে কল্পলোক নির্মাণের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। সেই সাথে জার্মান এক্সপ্রেসনিজম এর দশকে চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনাই অর্থবাহীর মূল হাতিয়ার হয়ে ওঠে। বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করে বিকৃত, অদ্ভুত, ছায়াচ্ছন্ন সেট ব্যবহার করা হয়, যা চরিত্রের মানসিক অবস্থা প্রকাশ করত। দি কেবিনেট অব ড. ক্যালিগারি (১৯২০) এর ক্লাসিক উদাহরণ যেখানে হারমান ওয়াম, ওয়াল্টার রোহরিগ ও ওয়াল্টার রেইমান আঁকাবাঁকা রাস্তা, কৌণিক স্থাপত্য ও সরাসরি আঁকা ছায়া ব্যবহার করেছিলেন, যা উন্মাদনা ও উৎকর্ষার ভিজুয়াল রূপ দেয়। সোভিয়েত মন্টাজ ও কন্সট্রাক্টিভিজমের এর সময় চলচ্চিত্রের সম্পাদনার দিকে মূল দৃষ্টি থাকলেও শিল্প নির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আইজেনস্টাইনের ব্যাটলশীপ পটেমকিনে (১৯২৫)-এ বাস্তব লোকেশন ব্যবহার হলেও সেগুলোর গঠনমূলক গুণাবলি ও প্রতীকী শক্তিই প্রাধান্য পেয়েছিল। উল্লেখ্যযোগ্য হলো ওডিসা সিঁড়ি, যুদ্ধজাহাজের কামান ইত্যাদি ছিল বাস্তব কিন্তু প্রতীকী ছিল শক্তি প্রদর্শনের। নির্বাক যুগে চলচ্চিত্রের সেট মূলত কাল্পনিক, বাস্তবিক এবং কল্পনা-বাস্তবের মিশ্রণ ছিল। যেখানে চলচ্চিত্রকে অসীম সম্ভাবনাময় হিসেবে দেখে কাল্পনিক বা রূপক অর্থে সেট ডিজাইন হতো। আবার বাস্তবিক চিত্র তুলে ধরে এ সকল পশ্চাতপট কে প্রতীকী অর্থে অর্থবহ হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

স্টুডিও নির্ভর যুগে চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনা

লুমিয়ার ভ্রাতৃদ্বয়ের হাত ধরে ১৮৯৫ সালে বিশ্ব চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হওয়ার কয়েক দশকের পর ই চলচ্চিত্র শিল্প বিশাল জোয়ার বয়ে আসে। তার মধ্যে প্রথম যে জোয়ার দেখা যায় তাহলো উন্নত দেশের চলচ্চিত্র যা বাণিজ্য ধারার স্টুডিও নির্ভর চলচ্চিত্র যাকে চলচ্চিত্রের স্বর্ণ যুগ বলা হয়। এ সময় চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার জন্য চলচ্চিত্রের অনেকগুলো বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ হিসেবে শিল্প নির্দেশনা বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। অর্থাৎ চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার গুরুত্ব অনুধাবন করা হয় এবং বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যেমন এমজিএম, প্যারামাউন্ট, ওয়ার্নার ব্রাদার্স নিজস্ব হাউস স্টাইল তৈরি করে, যা শিল্প বিভাগের প্রধানরা পরিচালনা করতেন। কেডরিক গিবন্স ৩০ বছর ধরে শিল্প নির্দেশনা বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন যেখানে বাণিজ্য ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রধান যে উপাদান জাঁকজমক উপস্থাপন সেখানে তিনি এমজিএম অর্থাৎ বিশাল বড় বড় পার্ক/রিসোর্ট এর আদলে

সেট তৈরি করা হতো। বিশাল স্টুডিও সেটে নির্মিত মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র (বেন-হার) বা অভিজাত কমেডি ছিল এই সময়ের বৈশিষ্ট্য। বিশ্বব্যাপী, জাপানি সিনেমা (মিজোগুচি ও কুরোসাওয়ারা) সূক্ষ্মভাবে প্রোডাকশন ডিজাইন ব্যবহার করেছে, যেখানে সাংস্কৃতিক নান্দনিকতার উপর ভিত্তি করে তৈরিকৃত তাতামি মাদুরের কক্ষ, সামুরাই গ্রাম বাস্তবতা ও ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করেছে। অন্যদিকে ভারতে, প্রারম্ভিক বলিউড চলচ্চিত্রগুলোতে জাঁকজমকপূর্ণ সেট ও পৌরাণিক পটভূমি সংযোজিত হয়েছিল, যা ভারতীয় শিল্প নির্দেশনার একটি স্বাক্ষর বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

যুদ্ধোত্তর বাস্তবতা ও রঙিন চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনা

১৯৪০ থেকে ১৯৬০ এর দশকে চলচ্চিত্রের নবরূপ আসে যাকে ইতালীয় নববাস্তবতা বলা হয়। চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ হলিউডে শিল্প নির্দেশনা ছিল অতিরঞ্জিত বাস্তবতা যেখানে বাস্তবতাকে কল্পনামিশ্রণ করে একধরনের গ্যামার যোগ করা হতো কিন্তু ইতালীয় চলচ্চিত্রে কৃত্রিমতা বর্জন করে স্টুডিওর বাহিরে বাস্তব নির্ভর শিল্প নির্দেশনা শুরু হয়। যেমন *দ্য বাইসাইকেল থিফট*। এ চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশকের কাজ ছিল বাস্তব পরিবেশ বাছাই ও সাজানো। সময়ের পরিক্রমায় ও প্রযুক্তি-চিন্তক পরিবর্তন সেট ডিজাইনকে নতুন মাত্রাযোগ করে। যেমন সেটে রঙের ব্যবহার ও সেনেমাস্কোপ এসব ফরম্যাট শিল্প নির্দেশনার ধারণা পাল্টে দেয়। ভিনসেন্ট মিনেলির এমজিএম মিউজিক্যাল এন আমেরিকান ইন প্যারিস (১৯৫১) এ কল্পনা ও বাস্তবতাকে মিশিয়ে রঙকে আবেগের প্রতিফলনে ব্যবহার করে। আবরা পাওয়েল ও প্রেসবার্গ দি রেড শোস (১৯৪৮) এ উজ্জ্বল রং তত্ত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা তৈরি করার প্রচেষ্টা করা হয়।

নিউ ওয়েভ ও আধুনিকতাবাদ ও শিল্প নির্দেশনা

ইতালীয় নববাস্তবতার পর ১৯৬০ থেকে ১৯৮০ এর দশকে ফরাসি নিউ ওয়েভ শুরু হয় যেখানে বাস্তবতাকে কৌশলগতভাবে নতুনরূপে ব্যবহার করা হতো। যেটা ১৯৬০ সালে নির্মিত ব্রেথলেস সিনেমায় দেখা যায়। বাস্তব রাস্তা, বাস্তব বড় বড় এপার্টম্যান্ট ব্যবহার করা হতো কিন্তু সেখানে প্রপ্‌স এবং টেক্সচারের মাধ্যমে সেখানে অতিবাস্তবতা তুলে ধরা হতো। যেখানে আধুনিকতার ছোঁয়া দেয়া চেষ্টা করা হতো। উচ্চ আধুনিকতার স্বরূপ মিকেলান্জেলো তার রেড ডেজার্ট (১৯৬৪) চলচ্চিত্রের সেট ডিজাইন চরিত্রের মানসিক প্রতিফলন রূপ দেখান যেখানে পুরো দৃশ্যপটকে ধূসর রঙে রাঙিয়ে দেন। ইতিমধ্যে, হলিউডের মহাকাব্যগুলি (লরেন্স অব এরাবিয়া, ১৯৬২, ২০০১ এবং এ স্পেস ওডাসেসি, ১৯৬৮) এ দেখিয়েছেন যে কীভাবে বৃহৎ আকারের শিল্প নির্দেশনা সিনেমাটোগ্রাফির সাথে মিশে দৃশ্যমান দৃশ্য তৈরি করতে পারে। এশীয় সিনেমায় সত্যজিৎ রায়ের (ভারত) এবং কিং হু (চীন/তাইওয়ান) এর মতো পরিচালকরা সাংস্কৃতিকভাবে নির্দিষ্ট সেট ডিজাইনের উপর জোর দিয়েছেন ছিলেন, বাস্তবতাকে স্টাইলাইজড ঐতিহ্যের সাথে মিশ্রিত করেছিলেন। অর্থ্যাৎ এই সময়ে এসে সিনেমায় নায়কের চরিত্রের প্রতিপলন শিল্প নির্দেশনার পশ্চাতপটের মাধ্যমে তুলে ধরার একটা চেষ্টা দেখা যায়। এবং সিনেমাটোগ্রাফির সুবিধার্থে আলোক সংবেদনশীল রূপে এবং মুভিং অবজেক্ট রেখে শিল্প নির্দেশনার ধারা দেখা যায়।

সমসাময়িক ও আধুনিক যুগে চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনা

চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার ধারাবাহিকতায় শিল্প নির্দেশনায় অথর ডিজাইনার বা পশ্চাৎপট নির্মাণে এক ধরনের নিজস্বতা তৈরি হয় এবং এক ধরনের প্রায়ুক্তিক বিপ্লব তৈরি হয়। কেন এডামকে আধুনিক যুগের সেট নির্মাণদাতা বলা হয়। যেখানে শিল্প নির্দেশনার মাধ্যমে সিনেমার যে মেজাজ সেটা ফুটিয়ে তোলা যায়। বর্তমান সময়ে চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনায় শুধু সেট সাজানো বা প্রপস ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্রের ভিজুয়াল গল্প বলার অন্যতম প্রধান উপাদান। আধুনিক চলচ্চিত্র শিল্প নির্দেশনা বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করছে, যা প্রযুক্তি, বাস্তবতা ও কল্পনার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। চলচ্চিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতাকে পর্দায় তুলে ধরতে চায়। এজন্য সেট ডিজাইন, লোকেশন সিলেকশন এবং প্রপস সবকিছু বাস্তবধর্মীভাবে উপস্থাপন করা হয়। যেমন প্যারাসাইট (২০১৯) চলচ্চিত্রটির দুই পরিবারের বিপরীত সামাজিক অবস্থান দেখাতে বাড়ির নকশা ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনে শিল্প নির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ভিএফএক্স নির্ভর সেটও দেখা যায়। যেমন সিজিআই, গ্রীনস্ক্রিন এবং ভার্চুয়াল প্রোডাকশন এখন শিল্প নির্দেশনার বড় অংশ। বাস্তব সেটের সঙ্গে ডিজিটাল পরিবেশ মিলিয়ে এক নতুন ভিজুয়াল দুনিয়া তৈরি করা হয়। যেমন *দি ওয়ে অব ওয়াটার* (২০২২) এ সম্পূর্ণ কাল্পনিক গ্রহ ও পানির নিচের জগৎ নির্মাণে শিল্প নির্দেশনা ও ভিএফএক্স এর নিখুঁত সমন্বয় দেখা যায়। সেইসাথে কালার প্যালেট ও ভিজুয়াল মুডের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। প্রতিটি দৃশ্যের আবেগ বা থিমকে ফুটিয়ে তুলতে নির্দিষ্ট রঙের ব্যবহার শিল্প নির্দেশনার অংশ হয়ে উঠেছে। যেমন *লা লা ল্যান্ড* (২০১৬) এ রঙের কন্ট্রাস্ট এবং মিউজিক্যাল সেট ডিজাইন দর্শকদের আবেগকে প্রভাবিত করে। সাংস্কৃতিক ও স্থানীয় উপাদানের ব্যবহার দেখা যায়। আধুনিক সিনেমা স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটকে শিল্প নির্দেশনার মাধ্যমে দৃশ্যমান করে। *প্যাডমাত* (২০১৮) ভারতীয় চলচ্চিত্র এ রাজস্থানি স্থাপত্য, পোশাক ও প্রপসের সমৃদ্ধ ব্যবহার স্থানীয় ঐতিহ্য ফুটিয়ে তোলে। অনেক সমকালীন চলচ্চিত্রে জাঁকজমক নয়, বরং প্রতীকী ও মিনিমাল সেট ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে দর্শক কাহিনীর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হতে পারে। যেমন *রোমা* (২০১৮) চলচ্চিত্রে সাদা-কালো ফ্রেম ও সাধারণ গৃহস্থালী পরিবেশ কাহিনীর আবেগকে আরও বাস্তব করে তোলে। বহুজাতিক প্রযোজনার কারণে এখন শিল্প নির্দেশনায় বৈশ্বিক নকশা, সংস্কৃতি ও নান্দনিকতার সমন্বয় দেখা যায়। *ডোনে* (২০২১) সিনেমায় মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপীয় ও সাই-ফাই ডিজাইনের সংমিশ্রণে নতুন ভিজুয়াল জগত তৈরি হয়েছে।

শিল্প নির্দেশনার ইতিহাস ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

বিশ্ব চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার ইতিহাস বলতে সাজেদুল আউয়াল রচিত চলচ্চিত্রচর্যা (২০১৯) নামক গ্রন্থে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্প নির্দেশক মহিউদ্দিন ফারুকের সাক্ষাৎকারে উঠে আসে যে ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান পরবর্তীতে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (এফডিসি) প্রতিষ্ঠার পর থেকে চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্য অনুসারে চলচ্চিত্র কলাকুশলীদের অভিনয়ের জন্য দৃশ্যপট নির্মাণে শিল্পীদের ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে সৈয়দ শামসুল হক রচিত চিত্রনাট্যে মহিউদ্দীন আহমেদ *মাটির পাহাড়* নামে বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র

নির্মাণ করেন। যেখানে শিল্প নির্দেশক হিসেবে নিউ থিয়েটার্স কাজ করা শিল্পী হাসান আলী। সাথে নবীশ পরীক্ষা হিসেবে কাজ করেন সুভাষ দত্ত। পরবর্তীতে মহিউদ্দিন নিজেই অনেক ছবির শিল্প নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছেন এবং বহুবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন বলে তিনি সাক্ষাৎকারে বলেন। তিনি ইনডোর এবং আউটডোর উভয় ক্ষেত্রেই চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনা দিয়েছেন এবং বাস্তব, ফ্যান্টাসি, বানিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্রের সেট নির্মাণে ভূমিকা রেখেছেন বলে সাজেদুল আউয়ালের কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উঠে আসে। বিশ্ব চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার ইতিহাস বিশ্লেষণ করে সুস্পষ্ট কিছু শিল্প নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য বা ফরম বা ধারা পাওয়া যায়।

বিশ্ব চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য

ভিজুয়াল পরিবেশ তৈরি: শিল্প নির্দেশনা একটি চলচ্চিত্রের সামগ্রিক মেজাজ, সুর এবং দৃশ্যমানতার পরিচয় প্রতিষ্ঠা করে। কোন চলচ্চিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব বা উত্তেজনা প্রকাশের জন্য বিকৃত এবং শ্যাডো সেট ব্যবহার করা হয়।

সেট ডিজাইন, প্রপস এবং লোকেশনের একত্রকরণ: কোন চলচ্চিত্রের পশ্চাত্পটের অবয়ব বাস্তবরূপে বা বিশ্বযোগ্য করে গড়ে তুললে সেট ডিজাইন, প্রপস এবং লোকেশনের সমন্বয় হতে হয়। শিল্প নির্দেশনা বিশ্বাসযোগ্য এবং নিমজ্জিত পরিবেশ তৈরি করতে ভৌত সেট, প্রপস এবং বাস্তব অবস্থানগুলিকে একত্রিত করে।

চিত্রগ্রহণের সহযোগী: চলচ্চিত্রে গল্প বাস্তবতায় পরিবেশের মেজাজ ঠিক করতে হয়। সেই মেজাজ যখন ক্যামেরায় ধারণ হবে তখন তার পূর্ণ প্রতিফলন হতে হয়। সেটের বাস্তব প্রতিফলন পেতে ক্যামেরার ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাতে সেট, আলো এবং প্রপস যা দৃশ্যমান গল্প বলার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আবার ক্যামেরার গতিবিধি ও কলাকৌশলীদের অভিনয়ের সুবিধার্থে শিল্প নির্দেশনার সময় কিছু চলন (মুভিং) অবজেক্ট রাখতে হয়।

ন্যারেটিভ এবং থিমের প্রকাশ: সেট এবং ভিজুয়াল ডিজাইন চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, গল্পে প্লটের উন্নতি এবং থিম্যাটিক সাবটেক্সটকে ব্যক্ত করে। যেমন আন্তোনিওর ‘রেড মরুভূমি’ শিল্পায়িত ল্যান্ডস্কেপ এবং মিউটেড রঙ ব্যবহার করে অস্তিত্বগত বিচ্ছেদের ভাব প্রকাশ করে।

রঙ এবং টেক্সচারের ব্যবহার: রঙের প্যালেট, টেক্সচার এবং উপকরণ মনোভাব-প্রতীকতাকে শক্তিশালী করার জন্য যত্নসহকারে নির্বাচন করা হয়। ‘অ্যান আমেরিকান ইন প্যারিস’ টেকনিকালার এবং স্টাইলাইজড সেট ব্যবহার করে উচ্চমাত্রার আবেগীয় প্রভাব তৈরি করে।

প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে অভিযোজন: চিত্রনাট্য পরিচালনার ধরণ চলচ্চিত্র প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে বিকশিত হয়েছে। হাতে আঁকা ব্যাকড্রপ বা স্কেচ থেকে কৌশলগত রঙ, ওয়াইডস্ক্রিন/ গ্রিনস্ক্রীন ফর্ম্যাট, সিজিআই, এবং ভার্চুয়াল প্রোডাকশনে রূপান্তর ঘটেছে। আধুনিক চলচ্চিত্রগুলো যেমন ‘দ্য ম্যাডালোরিয়ান’ এলইডি ভলিউম স্টেজ ব্যবহার করে বাস্তব এবং ডিজিটাল সেটকে নির্বিঘ্নে মিশ্রিত করে।

বাস্তবতাবাদ ও স্টাইলাইজেশনের সামঞ্জস্য: যুগ এবং ঘরানার ওপর নির্ভর করে, শিল্প নির্দেশনা বাস্তবতাকে অথবা কাল্পনিকতা কে প্রাধান্য দিতে পারে, প্রায়শই উভয়কেই মিশ্রিত করে।

অত্যর সমন্বয়: শিল্প নির্দেশনা প্রায়শই পরিচালক এবং প্রোডাকশন ডিজাইনারের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে, যা সিনেমার স্বতন্ত্র শৈলী তৈরিতে সহায়ক হয়। অর্থ্যাৎ পরিচালকের চিন্তাভাবনা সিনেমার পশ্চাত্পটের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

প্রতীকবাদ ও মনস্তাত্ত্বিক অনুসরণ: সেট এবং ভিজুয়াল শুধুমাত্র পটভূমি নয়; এটি অভ্যন্তরীণ অবস্থা বা সামাজিক পরিস্থিতিকে প্রতীক মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে। কোন চলচ্চিত্রের লোকেশনে যদি খাঁজযুক্ত, বিকৃত রাস্তা ব্যবহৃত হয় তাহলে মানসিক অস্থিরতার প্রতীক প্রকাশ করে।

চলচ্চিত্রের পরিচালক ও শিল্প নির্দেশক

সিনেমার শুটিংপূর্ব পর্যায়ে চিত্রনাট্যকারের সঙ্গে যেমন তেমনই শিল্প নির্দেশকের সঙ্গেও পরিচালকের যোগাযোগ জরুরি। এই প্রসঙ্গে ফেলিনি বলেছেন, ছবিতে সেট ডিসাইনের সঙ্গে আমার (পরিচালক) খুব গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যোগাযোগ থাকতে হয় বলে মনে হয়। পরিচালকের মন-মর্জি ও চিত্রনাট্যানুসারে একজন শিল্পনির্দেশক লেখকের পরিবর্তক হিসেবে কাজ করেন যা দর্শক শ্রোতাকে সিনেমার গভীরে ঢুকতে সাহায্য করে। একজন শিল্প নির্দেশক সিনেমার বা টেলিভিশন প্রোডাকশনের কোন চিত্রনাট্য পড়ার পর ভাবেন যে সেটটি ইনডোর হবে না আউটডোর এ হবে। চিত্রনাট্যানুসারে প্রাথমিক ড্রয়িং করেন, কোন কোন সময় ট্রস ড্রয়িংও করতে হয়। শিল্প নির্দেশক সেট স্কেচ করার সময় আগে ও পরের সেট ও লোকেশন পরিকল্পনা মাথায় রাখেন। সেটকে মেক বিলিভ মি করা হচ্ছে শিল্প নির্দেশকের প্রধান কাজ। প্রত্যেকটা সেট কে একেক টা চরিত্র মনে হয়। শিল্প নির্দেশনা শুধু কিছু অবয়ব তৈরি করা না, বরং পুরো সিনেমার মেজাজের সাথেই শিল্প নির্দেশকের যুক্ত হতে হয়। শুধু বাহ্যিক পরিবেশ নয়, চরিত্রের-ঘটনার ইনার ফিলিংসটাকেও ধরার চেষ্টা করতে হয়। লাইটিং করার সময় ক্যামেরাম্যান ছবির মুডের সাথে সঙ্গতি রেখে আলোকসম্পাদনও করতে পারেন তখন সেই মুড তৈরি করতে শিল্প নির্দেশককে সাহায্য করতে হয়। এইজন্য চলচ্চিত্র যে আলোক শিল্প তাও শিল্প নির্দেশককে বুঝতে হবে। শিল্প নির্দেশক দৃশ্যপটের প্রথম যে স্কেচটা করেন তখনই তিনি একটা লাইটিং প্যাটার্ন দিয়ে দেন মুড ক্রিয়েট করার জন্য। দৃশ্যপটের শ্যাড কোন দিকে যাবে এই বিষয়টা মাথায় রেখে টোন তৈরি করতে হয়। এই ক্ষেত্র বিশেষে ক্যামেরাম্যানকে শিল্প নির্দেশকের কথা শুনতে হয়। চিত্রনাট্য পড়ে প্রথম স্কেচ করার সময় চিত্রনাট্যে বর্ণিত সময়, পরিবেশ, যে স্টাইল অব প্রেজেন্টেশন ও মুড থাকে তার গুরুত্ব দিয়েই করতে হয়। বার্ডস আই এবং সাইডভিউগুলো স্কেচে ধরতে হয়। আর কম্পোজিশন, আলোকসম্পাদন, রং ইত্যাদির কাজটি ফ্লোরপ্লানের সময় করতে হয়।

চলচ্চিত্র শিল্প নির্দেশকের গুণাবলী ও দক্ষতা

একটি চলচ্চিত্রকে বাস্তব বলে প্রমাণ করতে যেসকল কাজ করতে হয় তার জন্য একজন শিল্প নির্দেশকের বহু গুণাবলী থাকার প্রয়োজন আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কল্পনা (Imagination), সহজাত প্রবৃত্তি

(Instinct), সহজাত জ্ঞান (Intuition), বুদ্ধি-মেধা-মনন (Intellect), চলচ্চিত্রের দৃশ্য নির্মাণে সংবেদনশীল হতে হয়, সূক্ষ্মদৃষ্টি শক্তি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা থাকতে হয়, রঙের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয় এবং চলচ্চিত্র নির্মাণে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হয়। এছাড়াও একজন শিল্প নির্দেশককে চারটি ডবলিউ সম্পর্কে জানতে হয়; Who কার জন্য, When কোন সময়কে ধরার জন্য সেট করা হচ্ছে, Why কেন করা হচ্ছে এবং Where কোথায় ঘটনাটি ঘটেছে। কোথায় করা হচ্ছে এই কাজটা প্রধানত মাঠপর্যায়ে করেন শিল্প নির্দেশক। শিল্প নির্দেশকের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প, গ্রাফিক্স-কলা এবং পোশাক পরিচ্ছেদ ও মেকআপের বিষয়ে কর্মদক্ষতা ও জ্ঞান, আর চিত্রগ্রহণ ও আলোক সম্পাদনের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। শুধু দৃশ্যপট না সিনেমার মেজাজ ও আবহ (atmosphere) অনেকটা এনে দেন শিল্প নির্দেশক। ফলে ফিল্ম সেন্স সম্পর্কেও তার সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। ড্রয়িং জানা, কম্পোজিশন জানা, টোনাল ভেরিয়েশন জানা, লাইটিং, রং সম্পর্কে জানা, জানতে হয় কিভাবে খালি একটা জায়গাকে এলিমেন্ট দিয়ে ভরে দিতে হয়-যাকে ইনডাক্টিভ বলে। আবার জানতে হয় কিভাবে ভরা জায়গা থেকে এলিমেন্ট সরিয়ে নিতে হয়-যাকে ডিটাক্টিভ বলে। নেতৃত্বের গুণাবলীও থাকতে হয়, থাকতে হয় যোগাযোগ দক্ষতা, সময় জ্ঞান থাকতে হয়। এ জন্য সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা শুধু শিল্পনির্দেশকেরই নয়, পরিচালকেরও সাংঘাতিক প্রয়োজন। এ ক্ষমতা না থাকলে কেউই ভালো শিল্পনির্দেশক বা পরিচালক হতে পারবেন না। উদাহরণস্বরূপ, যে নারী রান্না করেন, তিনি কাজের অবসরে অজান্তেই কোনো অবসরে বা ক্লান্তিতে অবচেতন মনেই বাঁশের খুঁটিতে তেল-মসলা মাখা হাত রেখে সামান্য বিশ্রাম নেন। দিনের পর দিন এভাবে করতে করতে তেল-মসলার নির্যাস থেকে খুঁটিতে তেল চিটচিটে ভাব চলে আসে। সেই সূক্ষ্ম বিবেচনা বোধ থেকেই ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’র রান্নাঘরের বাঁশের খুঁটিটি তেল চিটচিটে করা হয়েছিল। মেজাজ ঠিক রাখার জন্যও সিনেমার এস্টাবলিশিং শট কম্পোজিশন এর কাজ টাও শিল্প নির্দেশকের করতে হয়। শিল্প নির্দেশককে একই সঙ্গে বাস্তবাদী ও তীক্ষ্ণ কল্পনা প্রবণ হতে হয়, পরিবেশকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয়।

বিভিন্ন মাধ্যমের সেট ও ব্যবহার

সাধারণত বিভিন্ন মাধ্যমের জন্য চলচ্চিত্র সেট নির্মাণ করতে হয়। তার মধ্যে নাট্যমঞ্চও বেশিরভাগ সেট হয় সাজেস্টিভ। যাত্রামঞ্চও ঠিক একই রকম। টেলিভিশনের সেট ড্রয়িংরুম নির্ভর বা বেডরুম নির্ভর। টেলিভিশন কে বলা হয় অডিও ভিসুয়াল মাধ্যম উইথাউট ডিটেইলস। ডিটেনলস যাওয়ার প্রয়োজন হয় না বলে এই জন্যে যে, এখানে ক্যামেরাকে বেশিরভাগ সময় ক্লোসআপেই থাকতে হয়। এবং চলচ্চিত্র মাধ্যম হলো অডিও ভিসুয়াল উইথ ডেটেইলস। ফিল্ম রিয়েলটাইমকে এনলার্জ করতে হয়, ডেটেইলস এর বেশি প্রয়োজন হয়। চলচ্চিত্রের সেট আবার বিভিন্নধর্মী হয়। যেমন: অ্যাকশন ধর্মী, ঐতিহাসিক, সামাজিক, ফ্যান্টাসি ধর্মী, এবং বাস্তবধর্মী চলচ্চিত্রের সেট। এসব সেটের প্রকৃতিগত কারণেই তাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান যেমন অ্যাকশনধর্মী সেটের সাথে বাস্তবধর্মী সেটের পার্থক্য হলো অ্যাকশনধর্মীতে গ্যামাটাইম মূল আর বাস্তব এ বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তলায় মূখ্য বিষয়। এসব বিভিন্ন ধর্মী সেট নির্মাণে প্রথমে লোকেশন খুঁজতে হয় এবং লোকেশনকে চিত্রনাট্য উপযোগী করে তার পশ্চাৎপট নির্মাণ করতে হয় যা শিল্প নির্দেশকের দায়িত্ব। মাধ্যমভেদে সেট বিভিন্ন রকমের হতে পারে। তার মধ্যে আই টাইপ, এল টাইপ, ইউ টাইপ এবং বক্স টাইপ সেট বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আই টাইপ: এই টাইপটি সাধারণত এক দেয়াল বিশিষ্ট যেটি সাধারণত মঞ্চেই বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ মঞ্চে যেহেতু দর্শকের বসার স্থান নির্দিষ্ট। তবে চলচ্চিত্রের কোন কোন দৃশ্যের জন্য এ দেয়াল বিশিষ্ট সেট নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আবার টেলিভিশনে সংবাদ পাঠ বা ঘোষণার সময় এবং চলচ্চিত্রে সাধারণত দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার সময় এ ধরনের সেট ব্যবহৃত হয়। সাধারণত একজন যখন দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলে তখন এইসেট ব্যবহৃত হয়।

এল টাইপ: এই টাইপ সেট সাধারণত দুই দেয়াল বিশিষ্ট। একাধিক ক্যামেরা ব্যবহৃত করতে হলে এই সেট তৈরি করতে হয়। তাছাড়া টিভি স্টুডিওতে যেহেতু সরাসরি শব্দ গ্রহণ করা হয়, মাইক্রোফোন স্থান বদল করত হয়। প্রধানত টেলিভিশনের জন্য এই সেট বেশ উপযোগী। তবে অন্য দুই মাধ্যমেও এই সেট ব্যবহৃত হয়।

ইউ টাইপ: এই সেট টি সাধারণত তিন দেয়াল বিশিষ্ট। এটি মঞ্চোপযোগী নয় তবে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে স্বল্প জায়গা বা ছোট পরিবেশে সেট তৈরি করতে এই সেট ব্যবহৃত হয়।

বক্স টাইপ: এই সেট টি সাধারণত চার দেয়াল বিশিষ্ট হয়। এটি সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের সেট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কারণ চলচ্চিত্রে যেহেতু ক্যামেরায় ভিন্ন ভিন্ন শটের মাধ্যমে দৃশ্য ধারণ করতে; তাছাড়া উপর থেকে লাইটিং এর ব্যবস্থা করতে হয়। তবে বর্তমানে কিছু কিছু নাটকেও ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে স্টুডিওর ভিতরে নয় বরং বিভিন্ন বাড়ি ভিত্তিক শুটিং স্পটে তৈরি হয়।

সুতরাং উপর্যুক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকের কাছে এটায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, চিত্রনাট্যানুসারে চলচ্চিত্রের পশ্চাত্তপট নির্মাণে শিল্প নির্দেশকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেই ভূমিকা পালনে শিল্প নির্দেশকের অনেক গুণাবলী ও দক্ষতা থাকতে হয়। সেই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি চলচ্চিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করণের মূখ্য কাজটুকু করেন। এখন সেইসব কাজের ধারা বা ঐতিহাসিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও প্রায়ুক্তি প্রেক্ষাপটে ভিন্নতা রয়েছে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটে সেই ভিন্নতা খোঁজে বের করা এবং বিশ্লেষণ করায় এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশে গবেষণা হয়নি। বিচ্ছিন্ন কিছু কোন সম্পাদিক বইয়ের অধ্যায়ে, কোন সাক্ষাৎকার বা গণমাধ্যমে প্রকাশিত লেখা রয়েছে। তবে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ একটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নিয়েছে শিল্প নির্দেশনার ওপর। সেটিও কোন নির্দিষ্ট শিল্প নির্দেশকের কাজের স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণের জন্য। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনা: মহিইদ্দীন ফারুকের স্বাতন্ত্র্য শিরোনামে গবেষণা কর্মটি চলমান। এছাড়া অন্যকোন গবেষণা কর্ম সম্পর্কে স্পষ্ট করে জানা যায়নি। সুতরাং বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা: অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শিরোনামের গবেষণা কর্মটি পরিচালনা প্রয়োজনীয়তার স্বাক্ষর রাখে। সেই প্রয়োজনীয়তার আলোকেই গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করা হয়েছে।

২.২. গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো

বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা অধ্যয়নে চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব ও আচারণগত পরিবর্তন তত্ত্ব নামক দুটি তাত্ত্বিক কাঠামোর আঙ্গিকে প্রস্তাবিত গবেষণাটি পরিচালিত হবে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তত্ত্ব মূলত চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। কারণ তত্ত্ব হলো যা বাস্তবের অংশ নয়; কিন্তু বাস্তবকে ব্যাখ্যা করার জন্য গঠন করা হয়।

চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব: পৃথিবীর অন্যতম দৃশ্য মাধ্যম চলচ্চিত্র বহু শিল্পের সমহার। ভাবালুতায় পরিপূর্ণ চলচ্চিত্র মানব মনে বাস্তবতার নিরেখে শৈল্পিক দৃশ্যপট অংকন করে। আর এ দৃশ্যপট তৈরিতে নন্দনতত্ত্বের অসামান্য অবদান অনস্বীকার্য। নন্দনতত্ত্ব মূলত শৈল্পিক সৌন্দর্যকে নির্দেশ করে। চলচ্চিত্রে নন্দনতত্ত্ব গল্প বলার সামগ্রিক ভিজ্যুয়াল ও ভাষাগত বিষয়কে বোঝায়। দৃশ্যমানতার নন্দনতত্ত্বের মধ্যে চলচ্চিত্র শৈলী, চলচ্চিত্র টোন, ভিজ্যুয়াল বা মেজাজ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। চিত্রনাট্যের মেজাজের সাথে সঙ্গতি রেখে গল্প বলার দৃশ্যপট তৈরিতে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম দু'ভাবেই নন্দনকানন পরিচালিত হয়। চলচ্চিত্রকে শৈল্পিক উপস্থাপনে শিল্প নির্দেশনার ভূমিকা অনবদ্য কারণ এই শিল্প নির্দেশনায় সিনেমার চাক্ষুস চেহারা বা স্বতন্ত্রতাকে সংজ্ঞায়িত করে। দৃশ্যের স্বতন্ত্রতা ফুটিয়ে তুলতে ভিজ্যুয়াল উপাদানগুলো যেমন চিত্রনাট্যের পশ্চাপটের অবয়ব, চিত্রনাট্যের মেজাজকে ধারণ করতে সহযোগী উপকরণ (প্রপস) ইত্যাদি ভূমিকা পালন করে।

চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য তত্ত্বের অন্যতম উপাদান হলো মিস-ইন-সিন। মিস-ইন-সিন বলেতে দৃশ্যায়নে দৃশ্যমান সকল কিছুকে বোঝায়। দৃশ্যমানতা তৈরিতে অন্যান্য উপাদানগুলোর মধ্যে শিল্প নির্দেশনার অনুসঙ্গগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চিত্রনাট্যের স্থান ও সময়কে ধারণ করে এবং কলা-কুশলীদের আয়-ব্যয়ের দিকে নজর রেখে শিল্প নির্দেশনার কর্মযজ্ঞ অন্যান্য উপাদানগুলো যেমন চিত্রগ্রহণ, অভিনয়কর্ম ও আলোক সম্পাদন প্রভৃতিকে সরাসরি সহযোগিতা করে। সুতরাং চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা বিশ্লেষণে চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহার প্রাসঙ্গিক।

আচারণগত পরিবর্তন তত্ত্ব: মানুষের আচারণ পরিবর্তনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি উদ্দীপকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জন বি. ওয়াটসন এর মতে, মানুষের আচারণ এমন যে, যে কোন বাহ্যিক পরিবেশগত উদ্দীপকের প্রতি যৌক্তিক সাড়া দেয়। মানুষের আচারণ বোঝার এবং প্রভাবিত করার জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে আচারণগত পরিবর্তন তত্ত্ব। আচারণগত পরিবর্তনের তত্ত্বের মধ্যে অন্যতম হলো সামাজিক শিখন তত্ত্ব। সামাজিক শিক্ষণ তত্ত্বে আলবার্ট বান্দুরা (১৯৭৭) দাবি করেন পরিবেশগত ও মানসিক উভয় ধরনের উপাদানের সমন্বয়ে মানুষের আচারণ প্রভাবিত হয়। বান্দুরা তাঁর স্ব-কার্যকারিতা ধারণায় আরও বলেন, মানুষ তার আচারণ পরিবর্তনে নিজের দক্ষতাকে প্রাধান্য দেয়। মানুষের নিজস্ব দক্ষতা নতুন এবং তুলনামূলক চ্যালেঞ্জিং কর্মকাণ্ডকে গ্রহণ করতে উদ্দীপকের ভূমিকা পালন করে।

চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা চলচ্চিত্রের প্রায় শুরুর সময় থেকেই আলোচিত হচ্ছে এবং সময়ের আবর্তনে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে শিল্প নির্দেশনা ধারায় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ পরিবর্তন সাধনে বাহ্যিক উদ্দীপকের

প্রভাবে মানব মনের আচরণ কাজ করে। বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের রূপরেখা অঙ্কনে আচরণগত পরিবর্তন তাত্ত্বিক কাঠামো সহায়ক ভূমিকা রাখে।

৩. গবেষণা পদ্ধতি:

যেকোন গবেষণা পরিচালনায় একটি রূপরেখা আবশ্যিক। মূলত গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষণা পদ্ধতির চিত্র অঙ্কন করতে হয়। প্রস্তাবিত গবেষণাটি একটি ইতিহাসভিত্তিক গুণগত গবেষণা। গবেষণায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণার তথ্য আহরণ ও বিশ্লেষণে সাহিত্য পর্যালোচনা, আধেয় বিশ্লেষণের টেক্সচুয়াল এনাইলিসিস, বিষয়গত বিশ্লেষণ ও নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

৩.১. নমুনা সমগ্রক:

গবেষণা সমগ্রক হলো গবেষণার বিবেচ্য বিষয়ের সকল তথ্য। প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটির নমুনা হবে চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা সম্পর্কিত প্রকাশিত যেকোন বই, জার্নাল, সাময়িকী, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সাক্ষাৎকার, অডিও ও ভিডিও আধেয়, বাংলাদেশে নির্মিত চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্র শিল্প নির্দেশকগণ, চলচ্চিত্র পরিচালক, চলচ্চিত্র সমালোচক, চলচ্চিত্র বিশ্লেষক এবং চলচ্চিত্র বোদ্ধা প্রভৃতি বিবেচ্য।

৩.২. নমুনায়ন:

সমগ্রক থেকে নিয়মতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া হলো নমুনায়ন। অর্থাৎ নমুনায়ন হলো কোন বৃহৎ অংশের নির্বাচিত অংশ যা পুরো বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। নমুনায়ন সাধারণত গবেষণা প্রকল্পের ধরন, উদ্দেশ্য, গবেষণা সময় ও আর্থিক বিষয়ের দিকে নজর রেখে নির্বাচন করতে হয়। নমুনায়ন সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে। সম্ভাবনা ও নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন। প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটির নমুনা নির্বাচনের জন্য সম্ভাবনা ও নিঃসম্ভাবনা উভয় নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভাবনা নমুনায়নের ক্লাস্টার বা শ্রেণীবদ্ধ নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে বাংলাদেশে নির্মিত ও শিল্প নির্দেশনায় জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গত ছয় দশকে যথা ১৯৭১-১৯৮০, ১৯৮১-১৯৯০, ১৯৯১-২০০০, ২০০১-২০১০, ২০১১-২০২০ এবং ২০২১-বর্তমান চলচ্চিত্রসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সিনেমাসমূহ বেছে নেওয়ার কারণ হলো যেসকল সিনেমা শিল্প নির্দেশনায় পুরস্কারের ভূষিত হয়েছে সেকল সিনেমায় শিল্প নির্দেশনার নিদর্শনের আধিক্য রয়েছে বলে গবেষকের মনে হয়। আর গবেষণার সুবিধার্থেও পুরস্কারপ্রাপ্ত সিনেমাগুলো নির্বাচন করে নমুনায়নের সমগ্রককে ন্যারো ডাউন অথ্যাৎ ছোট করা হয়েছে। চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনা শাখায় জাতীয় পুরস্কার ঘোষণার পর থেকে (১৯৭৫-২০২২) এখন পর্যন্ত ৪৮ বার পুরস্কার ঘোষণা করা হয় তার মধ্যে শিল্প নির্দেশনা শাখায় ৩৭ টি চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত হয় যেখানে মাত্র ১৫ জন ব্যক্তি (শিল্প নির্দেশক) হিসেবে পুরস্কারে ভূষিত হয় অথ্যাৎ একই ব্যক্তি একাধিকবার পুরস্কার পেয়েছে। ৩৭ টি চলচ্চিত্র থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক এবং গুণগত তথ্যের জন্য ছয়টি চলচ্চিত্র আধেয় ও বিষয়গত বিশ্লেষণের জন্য নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হবে। নমুনাকৃত চলচ্চিত্রগুলো হলো সুভাষ দত্ত পরিচালিত ডুমুরের ফুল (১৯৭৮), চাষী নজরুল ইসলামের শুভদা (১৯৮৬), মতিন রহমান এর অন্ধ বিশ্বাস (১৯৯২), গৌতম

ঘোষের মনের মানুষ (২০১০), গাজী রাকায়ত এর গোর (২০২০) এবং রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিতের নোনাভেলের কাব্য (২০২১)। এ ছয়টি সিনেমা উদ্দেশ্যগতভাবে নির্বাচন করার পিছনে যুক্তি হলো স্বাধীনতার পর ছয় দশক থেকে ৬টি সিনেমা দশক প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে নেওয়া হয়েছে। আবার ছয় থেকে পছন্দসই সিনেমার মধ্যে ১৯৭১ থেকে ১৯৮০ সাল এই দশক থেকে সাহিত্য নির্ভর সামাজিক সিনেমা ডুমুরের ফুল (১৯৭৮) নেওয়া হয়েছে; ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ সাল এই দশক থেকে নাট্যধর্মী চলচ্চিত্র শুভদা (১৯৮৬); ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল এই দশকে ১৯৯২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাণিজ্য সিনেমা অন্ধবিশ্বাস; ২০০১ থেকে ২০১০ সাল এই দশকে ইতিহাস-জীবনী নির্ভর চলচ্চিত্র মনের মানুষ; ২০১১ থেকে ২০২০ সাল এই দশকে সামাজিক-মানবিক নাট্যধর্মী সিনেমা গোর (২০২০) এবং ২০২১ থেকে বর্তমান এই দশকে ২০২১ এ মুক্তিপ্রাপ্ত পরিবেশবিষয়ক সিনেমা নোনাভেলের কাব্য নির্বাচন করা হয়েছে। এই ছয়টি চলচ্চিত্র জনরা এবং বিষয়গত দিক থেকে আলাদা এবং শিল্প নির্দেশনার কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং প্রতিনিধিত্বমূলক সিনেমা থেকে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করেন গবেষক।

এছাড়াও উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিল্প নির্দেশকগণের মধ্য হতে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা দিয়েছেন এমন ছয়জন ব্যক্তিকে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। যারা ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ফ্যান্টাসি, অ্যাকশন, বাণিজ্যিক ইত্যাদি বিভিন্ন জনরার চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার কাজ করেছেন বা করে যাচ্ছেন। এসব শিল্প নির্দেশক তাদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ছয়জন বিখ্যাত শিল্প নির্দেশক হলেন আবদুস সবুর, তরুণ ঘোষ, উত্তম গুহ, মো. কলমতর, শিহাব নরুন নবী, হিমাদ্রি বড়ুয়া। নির্বাচিত ছয়জন শিল্প নির্দেশকের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা বিষয়ে বিস্তারিত অজানা তথ্য ওঠে এসেছে।

৩.৩. উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি:

প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য আধেয় বিশ্লেষণের টেক্সটুয়াল এনালাইসিস্, সাহিত্য পর্যালোচনা ও কেআইআই (মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার) পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। আধেয় বিশ্লেষণে নির্বাচিত চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ করে শিল্প নির্দেশনার ধারা বা প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। কেআইআই পদ্ধতিতে শিল্প নির্দেশকগণের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নমুনাকৃত চলচ্চিত্রগুলোর প্রিন্ট (সিডি বা ইন্টারনেট) থেকে সংগ্রহ করা হবে। সংগৃহীত চলচ্চিত্রগুলোর শিল্প নির্দেশনা তথ্য ব্যাকগ্রাউন্ড বা পশ্চাত্পটের পরিবেশ বার বার দেখে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এছাড়াও প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রধান সাক্ষাৎকার দাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য অর্ধেক-কাঠামোগত পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। এই পদ্ধতিতে বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নমালার চেকলিস্ট তৈরি করে তার উত্তরের জন্য সাক্ষাৎকার দাতাদের কাছে সরবরাহ করা হবে। সাক্ষাৎকার দাতাগণ নিজেদের মতো করে উত্তর করতে পারবে। অন্যদিকে মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম থেকে শিল্প নির্দেশনা সম্পর্কিত সাহিত্য

পর্যালোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভাগ থেকে যোগ্য শিক্ষার্থী নিয়োগ প্রদান করা হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৩.৪. তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি:

সাহিত্য পর্যালোচনা, কনটেন্টুয়াল আধেয় বিশ্লেষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিষয়গত বিশ্লেষণ ও আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হবে। তথ্য উপস্থাপনে টেবিল, ছবি এবং সাধারণ পরিসংখ্যানগত দিকও সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৪. তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৪.১. নির্বাচিত চলচ্চিত্রের আধেয় উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

নির্বাচিত ছয়টি চলচ্চিত্রসমূহ বার বার দেখে এবং নোট-স্ক্রিনশট নিয়ে শিল্প নির্দেশনার জায়গা থেকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দশক ধারাবাহিকতায় চলচ্চিত্রের আধেয়ের তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো।

ক) ডুমুরের ফুল চলচ্চিত্রের কাহিনী সংক্ষেপ:

ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীর লেখা *গলির ধারের ছেলেটি* গল্প অবলম্বনে সুভাষ দত্ত বাস্তবধর্মী সিনেমা নির্মাণ করেন। ডুমুরের ফুল চলচ্চিত্রটির গল্প মূলত গ্রামীণ বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। ছবিতে দরিদ্র পরিবারের টানাপোড়েন, সাধারণ মানুষের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা এবং গ্রামীণ জীবনের আবেগ-অনুভূতি ফুটে উঠেছে। প্রধান চরিত্রের (লাডু-পথ শিশু) জীবনের নানা টানাপোড়েন দরিদ্র, ভালোবাসা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক কুসংস্কার ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে কাহিনী। শৈশব ও কৈশোরের নির্দেশ দৃষ্টি থেকে শুরু করে যৌবনের দ্বন্দ্ব ও হতাশা, শেষ পর্যন্ত তা মানবিক আবেগ ও প্রতীকী ইঙ্গিতের মাধ্যমে গভীরতর অর্থ বহন করে।

ডুমুরের ফুল চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনা:

ডুমুরের ফুল সিনেমায় শিল্প নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন মহিউদ্দীন ফারুক। তার শিল্প নির্দেশনা বিশেষভাবে স্বীকৃত ও পুরস্কৃত হয়েছিল। একটি পথশিশুর জীবন কাহিনী নির্ভর এই চলচ্চিত্রে সেট ডিজাইন বাস্তব নির্ভর অর্থ্যাৎ রিয়েলিস্টিক। সিনেমাটির ভিজুয়াল ও নান্দনিক নকশা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী যা বাস্তবতাকে নির্দেশ করে। সিনেমার আবহ, পরিবেশ ও দৃশ্য বিন্যাসকে গল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শিল্প নির্দেশনার মাধ্যমে। সুভাষ দত্ত, যিনি তাঁর নিখুঁত পরিচালনা ও লেখনীর জন্য সুপরিচিত, তিনি মহিউদ্দিন ফারুকের মতো দক্ষ শিল্পীর সঙ্গে কাজ করে সিনেমাটিকে প্রাণবন্ত ও সার্থক করে তুলেন। ডুমুরের ফুল চলচ্চিত্রের আউটডোর লোকেশনগুলো মূলত ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় করা। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সদরঘাট, রেল স্টেশন প্রভৃতি লোকেশনে শ্যুট করা। সুভাষ দত্ত তার সিনেমায় মহিউদ্দিন ফারুকের মাধ্যমে কম বাজেটের মাধ্যমে নিম্নলিখিত

নির্দেশনার উপাদান ও ভাবনাগুলো ব্যবহার করেছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যবহার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সদরঘাট, রেল স্টেশন ইত্যাদি। চলচ্চিত্রের প্রামাণ্য ও গৃহভিত্তিক বাস্তব দৃশ্যপট শিশুকেন্দ্রিক কাহিনির আবেগঘন প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর মাধ্যমে দর্শক চরিত্রগুলোর দৈনন্দিন জীবন ও মানসিক জগতের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত হতে পেরেছে। প্রামাণিকতার উপর গুরুত্বারোপ করে ফারুক চলচ্চিত্রটিতে আড়ম্বরপূর্ণ সেট বা কৃত্রিম প্রপসের বদলে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য বস্তু, পোশাক এবং পরিবেশের স্বতঃস্ফূর্ততাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে। এর ফলে চলচ্চিত্রে একটি সমাজ-বাস্তবতারভিত্তিক নান্দনিকতা তৈরি হয়েছে। প্রতীকী মোটিফের ব্যবহার হিসেবে চলচ্চিত্রের শিরোনাম “ডুমুরের ফুল” নিজেই প্রতীকী তাৎপর্যে সমৃদ্ধ। প্রোডাকশন ডিজাইনে শৈশবের কোমলতা, নাজুকতা ও জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বকে ফুটিয়ে তুলতে সূক্ষ্ম প্রতীকী উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে, যা চলচ্চিত্রের আবেগঘন দিককে গভীর করেছে। সিনেমার প্রধান চরিত্র লাডুর পরিবারের (মা ও ছোট ভাই) গ্রামে অবস্থিত আবাসস্থল জরাজীর্ণ ছনের ঘর, বাড়ির উঠানে বিভিন্ন জাতের সবজীগাছ, ছোট ছনের পুঞ্জি, কুপি বাতি, ডিজেলের হারিকেন, লাডুর মাছ ধরার বর্শি, মাছ রাখার মাটির পাত্র, মাছ ধরার জন্য বর্শিতে লাগানো ছোক জাতের কেচু, মাটির ও টিনের রান্নার আসবাবপত্র, চোলায় ফু দেওয়ার বাশের তৈরি চোঙ্গা, মাটির চোলা/উনুন প্রভৃতি বাস্তবধর্মী এবং পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সময় ধারণ করে শিল্প নির্দেশক কাজ করেছেন।



শহরে লাডুর থাকার তাবু, সেখানে ব্যবহৃত আসবাবপত্র, কুপি বাতির পরিবর্তে মমের বাতি, দেয়ালে টানানো ঘোড়ার ছবি যেটা দেখে লাডু সপ্ন দেখে সে একদিন রাজপুত্র হবে, সবাই তার জন্য খাবার নিয়ে আসবে ইত্যাদি,

তখন আর খাবার অভাব থাকবে না। লাড়ুর ব্যবহৃত ভাঙ্গা আয়না ও চিরুনি।



লাড়ুর ছোট তাবুটি জুতার বস্কে সাথে ছেড়া পানি নিরোধক কাগজ দিয়ে তৈরি। ঘুম থেকে উঠে লাড়ু টয়লেট এ যাবার জন্য ফুটো কৌটায় পানি ভরলে পরে যায়। এখানে শিল্প নির্দেশক নিপুনকার পরিচয় দিয়েছেন। একজন পথশিশুর কোন কিছুই পরিপূর্ণ থাকার কথা না। যেটা ভাঙ্গা পানির কৌটা দিয়ে বুঝিয়েছেন। যা বাস্তব বলে মনে হয়েছে।



লাডুর জ্বও হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে রেখে আছে কোন অচেনা ব্যক্তি। সেই হাসপাতাল টি ঢাকা মেডিকেল নির্দেশ করা হলেও বাস্তবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কোন কক্ষ নয়। মূলত ঢাকা মেডিকেল কলেজের আদলে নির্মাণ করা কোন কক্ষ। বাস্তব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যথেষ্ট যায়গা নেই যার মাধ্যমে ক্যামেরা মুভমেন্ট করতে অসুবিধা হবেনা। তাই ক্যামেরা মুভমেন্ট এর সুবিধা এবং ঢাকার অন্যতম হাসপাতালের কোন কক্ষ দীর্ঘ নিদেও জন্য ভাড়া নেওয়া সম্ভব নয়। সব কিছু বিবেচনায় নিয়ে শিল্প নির্দেশক হাসপাতালের বাস্তব পরিবেশ নিপুন হাতে তৈরি করেছেন। ডুমুরের ফুল শুধু শিশুকেন্দ্রিক কাহিনি নয়, বরং নান্দনিক শিল্প নির্দেশনা, গ্রামীণ বাস্তবতা এবং প্রতীকী ইঙ্গিতের মাধ্যমে বাংলা চলচ্চিত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। চলচ্চিত্রটি বাস্তববাদী চলচ্চিত্রধারা এবং প্রতীকবাদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে, যা একদিকে গ্রামীণ জীবনের সরলতাকে উপস্থাপন করেছে, অন্যদিকে মানবিক আবেগের গভীরতাকেও স্পর্শ করেছে। চলচ্চিত্রটির শিল্প নির্দেশনাকে তাত্ত্বিকগত গভীর বিশ্লেষণ করলে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র দেখা যায়।

বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি: চলচ্চিত্র গবেষক আন্দ্রে বাজাঁ এর বাস্তবতাবাদ তত্ত্ব অনুসারে, চলচ্চিত্রের শক্তি নিহিত থাকে তার বাস্তবতাকে অক্ষুণ্ণভাবে উপস্থাপনের ক্ষমতায়। ডুমুরের ফুল-এ সুবাস দত্ত যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, গ্রামীণ ঘরবাড়ি, মাঠ-ঘাট ও দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র ব্যবহার করেছেন, তা বাজাঁর “সিনেমাটিক রিয়ালিজম”-এর এক প্রতিফলন। এখানে শিল্প নির্দেশনা দর্শককে কৃত্রিম জগত নয়, বরং বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ ঘটায়, ফলে শিশুকাহিনির আবেগ আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রতীকবাদ: চলচ্চিত্রটির নাম ডুমুরের ফুল নিজেই প্রতীকী তাৎপর্যে সমৃদ্ধ। ডুমুরের ফুল সাধারণ চোখে অদৃশ-এটি প্রতীক করে শিশুকালের কোমলতা, নাজুকতা ও অপ্রকাশিত আবেগকে। দত্তের প্রোডাকশন ডিজাইনে সূক্ষ্ম প্রতীকী উপাদান (যেমন প্রকৃতির দৃশ্য, গাছপালা বা শৈশবের খেলনা) শিশুকালের ভঙ্গুর অথচ অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে উপস্থাপন করেছে। প্রতীকবাদের এই প্রয়োগ চলচ্চিত্রে এক ধরনের কাব্যিক আবহ তৈরি করে।

আবেগঘন ভিজুয়াল স্টাইল: সুবাস দত্তের চলচ্চিত্রগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ভিজুয়াল গল্প বলা। ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল, লোকেশন নির্বাচন, এবং সেট ডিজাইন সবকিছু একসঙ্গে মিলে চরিত্রগুলোর আবেগঘন অভিজ্ঞতাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। ডুমুরের ফুল-এ শিশুর জগৎকে প্রতীকী প্রকৃতি ও বাস্তবতার জীবনের পরিবেশে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা একদিকে দর্শককে কাহিনির ভেতরে ডুবিয়ে রাখে, অন্যদিকে আবেগকে বহুমাত্রিক করে তোলে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট: চলচ্চিত্রটি মুক্তির সময় বাংলাদেশ সদ্য স্বাধীনতার পথে অগ্রসরমান। সমাজ তখন সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। এই প্রেক্ষাপটে ডুমুরের ফুল একদিকে শিশুকেন্দ্রিক গল্পের মাধ্যমে মানবিক বোধ জাগিয়েছে, অন্যদিকে শিল্প নির্দেশনার প্রামাণিকতা সেই সময়কার গ্রামীণ জীবনের সাংস্কৃতিক সত্যকে ধারণ করেছে।

খ) **শুভদা সিনেমার কাহিনী সংক্ষেপ:** কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘শুভদা’ অবলম্বনে নির্মিত একটি সিনেমা। চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত এই সিনেমাটি ১৯৮৬ সালে নির্মিত হয় যা জাতীয় চলচ্চিত্রের বিভিন্ন শাখায় পুরস্কার লাভ করে। হলুদপুর গ্রামের একটি গরিব ঘরের হারানের বউ শুভদা। বিশেষ করে তার বিধবা মেয়ে ললনা ও চঞ্চল মেয়ে ছলনার গল্প বলে। হারানের স্ত্রী শুভদা একজন অসুস্থ ছেলে মাধবকে নিয়ে একটি অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে, যখন তার মেয়ে ললনা শরীর বেচতে কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানো ও পথিমধ্যে এক জমিদারে পাণিগ্রহণ এবং তার একটি সন্তান হয়। সেই সাথে শুভদার পুত্র মাধবের মৃত্যুর জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা, এবং তার স্বামীর নিজের ঘরে ডাকাতি, দুই মেয়ে, অসুস্থ ছেলে, বিধবা ননদ, এবং দায়িত্বহীন, মাতাল স্বামীকে নিয়ে সংসারে টিকে থাকার গল্প ‘শুভদা’।

শুভদা সিনেমার শিল্প নির্দেশনা: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘শুভদা’ অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছিলেন চাষী নজরুল ইসলাম। এর শিল্প নির্দেশনা মহিউদ্দিন ফারুক পরিচালকের নির্দেশনায় ও চিত্রনাট্যের মেজাজের সাথে ঠিক রেখে বাস্তবভিত্তিক নির্দেশনা দিয়েছে। এখানে মূলত বাস্তবমী ধারায় নির্মিত, যাতে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্রদের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও দারিদ্রের নির্মম বাস্তবতার দৃশ্যমানতা হয়েছে।

গ্রামীণ জীবন ও লোকালয়ের বাস্তবতা: চলচ্চিত্রে শুভদার সংসারকে দেখানো হয়েছে একটি জরাজীর্ণ কুড়েঘর যা পরিত্যক্ত পুরোনো আমলের কাচা-পাকা ইটের বাড়ি কিন্তু ঘরের ভিতরে যেসব প্রপ্স ব্যবহার করা হয়েছে তার একদম বাস্তব চিত্র তোলে ধরে। ভেতরের সেট ডিজাইনে অতি সামান্য আসবাবপত্র একটি খাট, কিছু মাটির হাড়ি-পাতিল, আর একটি চুলা যা দরিদ্র পরিবারের প্রতিচ্ছবি। এই ভৌত পরিবেশ দর্শকের কাছে শুভদার দারিদ্রকে স্পষ্টভাবে অনুভূত করে।



ছবিতে দেখা যায় একটি ভাঙাচোরা, জরাজীর্ণ বাড়ি। দেওয়ালের রঙ উঠে গেছে, আস্তগুলো ক্ষয় গেছে, দরজাগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। যা শুভদার সংসারের দারিদ্র, অস্বচ্ছলতা ও অবহেলিত জীবনযাপনের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।



চরিত্র বিন্যাস ও ব্যবহৃত সামগ্রী: নারী চরিত্রটি (শুভদা) সাদা শাড়ি পরে আছে, হাতে দেশীয় হাতপাখা। সাদা শাড়ি সাধারণত বিধবা বা মধ্যবিত্ত/দরিদ্র নারীর সরল পোশাকের প্রতীক। পুরুষের চরিত্রটির পরনে মলিন ধুতি ও ঢিলেঢালা জামা যা তার কর্মহীনতা ও শারীরিক দুর্বলতার ইঙ্গিত দেয়। পোশাক নির্বাচন ও চরিত্র বিন্যাসে বাস্তববাদী শিল্প নির্দেশনা লক্ষ্য করা যায়।

রঙ ও পরিবেশ: ছবিতে একটি হালকা বেগুনি-ধূসর টোন ব্যবহার হয়েছে, যা মলিনতা, ক্লান্তি ও দারিদ্র্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করেছে। আলো-অন্ধকারের ব্যবহার এমনভাবে করা হয়েছে যাতে পরিবেশ আরও বিষণ্ণ ও কঠিন মনে হয়।

প্রপস ব্যবহার: হাতে ধরা হাতপাখা, ভাঙা বাড়ি, চেয়ার সবই গ্রামীণ ও দরিদ্র জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেইসাথে প্রপসগুলোতে কোনো আড়ম্বর নেই, বরং সরল ও বাস্তব পরিবেশ তুলে ধরা হয়েছে।



এই স্ক্রিনশটটির দিকে তাকালেও প্রায় একই অবস্থা প্রকাশ করে যেখানে পলেন্ডার ওঠা দেয়াল, নির্ধারিত কাঠের দরজা, পুরনো বিছানা ও সাদামাঠা কাপড়, ছেঁড়া মোটা ঘরাচ্ছন্নতার ইঙ্গিত দেয়, যা বাংলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারের বাস্তবতার পরিচায়ক। সিনেমায় প্রধানত ধূসর, বাদামি ও প্রায় অনুজ্জ্বল রঙ ব্যবহার হয়েছে, যা দারিদ্র্যের ছাপধারী পরিবেশ ফুটিয়ে তোলে এবং গল্পের বিষণ্ণতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। চরিত্রদের পরনে সাধারণ সাদা ধুতি, শাড়ি, ও গামছাসংসারের বউ-স্বামী-শিশুর সাদামাটা গ্রামীণ পোশাক দৃশ্যমান, এতে করে অভাবী ও উপেক্ষিত পরিবারের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। বিছানার চাদর, টেবিল, দেয়ালে টাঙানো পুরনো ছবি, দরজায় তালা ও ঘরের ন্যূনতম সংসারের উপকরণ চিত্রনাট্য ও উপলব্ধির সাথে মিলিয়ে শিল্প নির্দেশক দক্ষভাবে পরিবেশন করেছেন।



চলচ্চিত্রের পুরুষ চরিত্র হারান চুরির দায়ে চাকুরি হারিয়ে দরিদ্র পরিবারের সামান্য জমানো মাদুলি অসুস্থ্য ছেলের জন্য ডালিম কিনার কথা বলে নিয়ে এসে মদের আসরে মজেছেন। এই চিত্রটিও রাতের একটি দৃশ্য যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধরা হয়েছে তবে মদের আসর বুঝাতে আরও একটু বিচক্ষণার পরিচয় দেয়া যেত।



জমিদারবাড়ির অভিজাত আবহ ও অভিজাত্য: ছবির সেটে ব্যবহৃত রয়েছে বড় এবং প্রশস্ত খাঁচের দরজা, জোড়াল ভাজা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠের ফ্রেম ও নকশা করা কাচের জানালা, যা জমিদার পরিবারের ঐতিহ্যবাহী বাড়ির অভিজাত্যকে প্রতিফলিত করে। মেঝের জ্যামিতিক প্যাটার্ন ও ধূসর-সাদা রঙের মিলেমিশে থাকা টাইলস নির্দেশ করে এক সুশৃঙ্খল, অভিজাত ও শক্তিশালী পরিবারের সামাজিক প্রেক্ষাপট।

প্রশস ও চরিত্রের অবয়ব: নারীর গায়ে বিমর্ষকণ্ঠযুক্ত লাল শাড়ি, সোনার গয়না ও শাড়ির কাঁথা অংশে বিশদ প্রাচ্যের ঐশ্বর্যের ইঙ্গিত দেয়, যা তার জমিদারি পরিবারের স্তরের পরিচায়ক। পরুষ চরিত্রের পরনে সাদা পাঞ্জাবী ও ধুতি, যা ঐতিহ্যগত ও শালীনতা প্রকাশ করে।

আলোকসম্পাদন ও পরিবেশ: ছবিতে সুস্পষ্ট কৃত্রিমভাবে তৈরিকৃত আলোকসম্পাদন দেখে বোঝা যায় এটা জমিদারবাড়ির ভেতরের মূল ভবনের ঘর, যেখানে হালকা সরাসরি আলো পড়ে দেয়ালের পোড়া অংশে ছায়া নির্মাণ করেছে; যা আবহকে নাটকীয়তা প্রদান করেছে। গোটা দৃশ্যপট দর্শককে একটি ঐতিহ্যবাহী, সামাজিক মর্যাদা সংবলিত পরিবেশে নিয়ে যায় যেটি উৎসাহী ও সংকটগ্রস্ত সম্পর্কের পটভূমি হিসেবে কাজ করে।

সুতারং শুভদার জরাজীর্ণ ঘর দারিদ্রের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যেখানে ভাঙাচোরা মাটির দেয়াল টিনের ছাউনি, জরাজীর্ণ ভেতরে সামান্য আসবাবপত্র ব্যবহৃত হয়েছে। আবার মলিন, ধূসর ও মাটির রঙ দারিদ্র ও কষ্টের বাস্তবতা প্রকাশ করে। প্রশস হিসেবে হাতপাখা, মাটির হাড়ি, ভাঙা চেয়ার সবই নিম্নবিত্ত পরিবারের প্রতিচ্ছবি। শিল্প নির্দেশনা এখানে দর্শককে চরিত্রদের অসহায়ত্ব অনুভব করার ইঙ্গিত দেয়। অন্যদিকে ললনার নতুন অধ্যায়ে অর্থ্যাৎ জমিদার বজরার সাথে বিয়ে এবং আলিসান জমিদার বাড়িতে থাকা যেখানে পান্না, খাট, পর্দা, কারুকাজ করা আসবাবপত্র অভিজাত্যের পরিচায়ক। চিত্রনাট্যনুসারে চলচ্চিত্রের যে শিল্প নির্দেশনা তা তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করলে আরও শিল্প নির্দেশনার ধারা ও বাস্তবতা ফুটে উঠবে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস শুভদা অবলম্বনে চাষী নজরুল ইসলাম নির্মিত চলচ্চিত্রটি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে শিল্প নির্দেশনা বাস্তববাদী শৈলীতে নির্মিত, যা দরিদ্র পরিবার, গ্রামীণ সমাজ এবং জমিদার শ্রেণির বৈপরীত্যকে তুলে ধরে।

দরিদ্র সংসারের চিত্রায়ণ: শুভদার সংসার চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে একটি ভাঙাচোরা কড়েঘরের মাধ্যমে। জরাজীর্ণ দেয়াল, ক্ষয়প্রাপ্ত আস্তর, অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর দারিদ্র্যের নির্মম বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছে। সামান্য আসবাব, মাটির হাড়ি, দেশীয় হাতপাখা সবই জীবনের অনটনকে প্রতীকী অর্থ দিয়েছে। শুভদা ও তার পরিবারের জীর্ণ কাপড় তাদের সামাজিক অবস্থানকে দৃশ্যমান করেছে। শিল্প নির্দেশনার এই বাস্তবতা দর্শককে চরিত্রদের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে আবেগগতভাবে যুক্ত করে।

জমিদার ও বজরার বৈপরীত্য : ললনার নতুন জীবনের পর্বে শিল্প নির্দেশনা একেবারেই পরিবর্তিত হয়। জমিদারের বাড়িতি ও বজরার দৃশ্যে অভিজাত্য, উজ্জ্বল রঙ এবং কারুকাজ করা আসবাব ফুটে ওঠে। বজরা, নদী ও খোলা প্রান্তরের পরিবেশ ললনার ভাগ্যের ভেসে যাওয়া ও নতুন অধ্যায়ের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেখানে দরিদ্র

কুঁড়েঘর ও জমকালো জমিদারবাড়ির বৈপরীত্য চলচ্চিত্রে শ্রেণিবৈষম্যকে আরও প্রকট করে তোলে তবে শিল্প নির্দেশনার দৃষ্টিকোন থেকে চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

সুতরাং শুভদা চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনা কেবল বাস্তবতা উদাহরণ নয়; এটি চরিত্র ও কাহিনির মানসিক গভীরতাকে প্রতীকীভাবে ফুটিয়ে তোলে। দরিদ্র ঘরের ভাঙাচোরা সেট, জমিদারবাড়ির অভিজাত্য, বজরার প্রতীকী তাৎপর্য এবং আলো-ছায়ার বৈপরীত্য একত্রে দর্শকের সামনে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক দারিদ্র্য-চেতনা ও সামাজিক বৈষম্যকে দৃশ্যমান করেছে।

গ) **অন্ধবিশ্বাস চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত কাহিনী:** বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক, শিক্ষক ও গবেষক মনিতন রহমান পরিচালিত ‘অন্ধ বিশ্বাস’(১৯৯২) বাংলাদেশী রোমান্টিক নাটকীয় চলচ্চিত্র, যা মূলত প্রেম বনাম অর্থের দ্বন্দ্ব এবং একে অপরের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব নিয়ে নির্মিত। সিনেমাটির কাহিনী বলতে রাজা (রাজ্জাক) ছোটবেলায় দারিদ্র্যের কারণে মায়ের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে। পরে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি ধনী হয়ে ওঠেন। তার বিশ্বাস, জীবনে সুখ এনে দিতে পারে কেবল অর্থই। অন্যদিকে, তার বন্ধু আলম (আলদগীর) মনে করে ভালোবাসাই জীবনের প্রকৃত সুখ, আর সে ভালোবাসে নীলাকে (শাবানা)। রাজাও নীলাকে পছন্দ করে এবং তাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চায়। কিন্তু অহংকারের কারণে নীলা তাকে অপছন্দ করে এবং আলমকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিয়ের দিন আলম দুর্ঘটনার শিকার হয় এবং নীলা সাহায্যের জন্য রাজার কাছে যায়। এ ঘটনায় রাজার অর্থ সম্পর্কিত বিশ্বাস আরও গভীর হয়।

সিনেমা অন্ধবিশ্বাস একটি মানসিক ও আবেগঘন গল্প উপস্থাপন করে, যখানে প্রধান চরিত্র রাজা ও আলমের জীবন দর্শন এবং নীলার সঙ্গে সম্পর্কে জটিলতা ফুটে ওঠে। শিল্প নির্দেশনা মূলত এই আবেগ, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং চরিত্রের মানসিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রখে নির্মিত হয়েছে।

সেট ও লোকেশন ডিজাইন: রাজার গৃহস্থালি এবং ধনী পরিবেশের দৃশ্যগুলোতে শোভন, বড় আয়তনের ঘর, নজরকাড়া আসবাবপত্র এবং সোনালী টোনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এগুলো রাজার অর্থে প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং সামাজিক উচ্চতার প্রতিফলন। বিপরীতে, আলম ও নীলার সাধারণ, মধ্যবিত্ত পরিবেশের দৃশ্যগুলো বাস্তবমুখী এবং সরল, যা তাদের সাধারণ জীবন ও ভালোবাসার সরলতাকে প্রকাশ করে।

রঙের ব্যবহার: রাজার জীবনের দৃশ্যে প্রাধান্য পায় উজ্জ্বল ও সোনালী রঙ, যা অর্থ এবং ক্ষমতার প্রতীক। নীলা ও আলমের দৃশ্যে নরম ও প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহৃত হয়েছে, যা হৃদয় সংক্রান্ত সম্পর্ক এবং মানবিকতা প্রকাশ করে।

প্রপস এবং ব্যবহৃত সামগ্রী: রাজার অভিজাত জীবনের প্রপসগুলো (মূর্তি, চিত্রকলা, সোনার জিনিসপত্র) তার অহংকার ও অর্থের প্রতি আসক্তি নির্দেশ করে। নীলা ও আলমের দৈনন্দিন সামগ্রী সহজ, ব্যবহারিক এবং বাস্তবমুখী, যা গল্পের বাস্তবতাকে শক্তিশালী করে।

আবহ পরিবেশ ও আবহায়া: দুর্ঘটনার সময় এবং আবেগপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে হালকা ছায়া, মৃদু আলো এবং সংকীর্ণ স্থান ব্যবহার করা হয়েছে, যা নাটকীয়তা এবং চরিত্রের মানসিক চাপ বৃদ্ধি করে। আনন্দময় বা প্রেমময় দৃশ্যে উন্মুক্ত স্থান, প্রাকৃতিক আলো এবং নরম রঙের ব্যবহার দৃশ্যের উজ্জ্বলতা ও প্রাকৃতিকতা বাড়ায়।

চরিত্রের মানসিক অবস্থা প্রতিফলন: শিল্প নির্দেশনা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে তাতে প্রতিটি স্থান, রঙ এবং প্রপস চরিত্রের মানসিক অবস্থা এবং গল্পের মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। উদাহরণস্বরূপ, রাজার অহংকারপূর্ণ দৃশ্যে স্থান বড় এবং আলোকিত, কিন্তু নীলার হতাশা বা সহানুভূতির দৃশ্যে স্থান সংকীর্ণ ও ছায়া যুক্ত। নিচে দৃশ্যবলী ধরে ধরে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।



অন্ধকার ও নীলাভ আলোর ব্যবহার: ছবিটিতে বেশির ভাগ অংশে নীলাভ আলোর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যা দারিদ্র্য এবং মানসিক অবস্থা প্রদর্শনে কার্যকর। এটি গল্পের শুরুতে রাজা ও তার পরিবারের অর্থনৈতিক কষ্ট এবং জীবনের অন্ধকার দিককে প্রতিফলিত করে।

ছায়ার ব্যবহার: ছবিতে চরিত্রদের ছায়ার প্রভাব স্পষ্ট, যা তাদের মানসিক দ্বন্দ্ব ও উদ্বেগের প্রতীক। বিশেষ করে রাজার বাবার হাতে বোতল নিয়ে মৃদু নিষ্প্রাণ ভাব প্রকাশ করছে, যা তার হতাশা ও মানসিক সংগ্রামের পরিচায়ক।

পরিবেশ ও স্থাপত্য: ঘরখানা বেশ সরল এবং খুবই সাধারণ, যা দারিদ্রের পরিস্থিতি বোঝাতে সহায়তা করে। ছবির মধ্যে দেখা যায় খুবই সাধারণ আসবাবপত্র এবং দেয়ালে বিভিন্ন রকমের সেনিয়ার পোস্টার যা পরিবারের অস্থিতিশীলতা ও সামাজিক অবস্থা নির্দেশ করে।



লোকেশন ও সেট ডিজাইন: অন্ধ বিশ্বাস সিনেমায় রাজা (রাজ্জাক) মা হারিয়ে আশ্রিত মায়ের অধীনে থাকে। কিন্তু ছোট বেলায় কষ্ট ভোগ করেছেন বলে ধীরে ধীরে পরিশ্রম করে অনেক টাকার মালিক হয়ে আলিসান জীবন যাপন করছেন। সেটটি প্রকৃতিগতভাবেই চার দেয়ালের হয়েছে যা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রের বেশি ব্যবহৃত হয়। পাত্রপাত্রীর আয় ও চরিত্রের মৈজাজ অনুযায়ী সেট ডিজাইন করা করা হয়েছে। যা সমাজের বাস্তবতার প্রদর্শন করে। তার বাস্তব প্রতিচ্ছবি উপরের সেট ও লোকেশনের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। সেটের ডিজাইন উচ্চ আয়ের বিলাসী জীবন যাপনকে নির্দেশ করছে। শহরের উচ্চ সমাজের প্রতীকিত স্বরূপ লোকেশন শহরে হয়েছে। যেখানে কলকারখানা ও নাগরিক সুবিধাসহ বিলাসী জীবন যাপন করার সুযোগ রয়েছে।

প্রশস ও ব্যবহৃত সামগ্রী: সেট ডিজাইন বা বাস্তব পরিবেশন ফুটিয়ে তোলার জন্য সেটে চার দেয়াল নির্মাণের পাশাপাশি ব্যবহৃত প্রশস এর অবস্থান দেখাতে হয়। এখানে রাজা উচ্চ-বিলাসী জীবন যাপনকে নির্দেশ করার জন্য বেডরুমে আধুনিক সাইট টেবিল, উন্নত মানের টেবিল ল্যাম্প, অত্যাধুনিক গ্লাসসহ ড্রয়িং টেবিল, অস্থিও জীবন যাপননে নির্দেশ করতে রাজার হাতে অ্যালকোহলসহ বোতল ব্যবহার করা হয়েছে। যা বাস্তব সমাজে দেখা যায়।

রঙ ও টেক্সচার: গল্পের মেজাজ প্রকাশের জন্য রঙ এবং টেক্সচার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখান ওয়ার্ম কালার প্যালেট ব্যবহার করা হয়েছে যা আনন্দ ক্ষেত্র বিশেষে দুঃখ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। টেক্সা হিসেবে দেয়ালে লালচে ভাব রাখা হয়েছে যা বেদনা ও সুখের বা আভিজাত্যের অর্থ প্রকাশ করে।



সিনেমার জন্মদিন পালন বুঝাচ্ছে এই স্ক্রিশট টি উচ্চ শ্রেণীর জন্ম পালনের দৃশ্য বোঝানো হয়েছে যেখানে কালারফুল বেগুন, মোবাতি, কেক, ইভেন ব্যবহৃত ব্যক্তি প্রতিকৃতি উপহার হিসাবে দেখানো হয়েছে। যা বাস্তবে হয়তো কিছুটা অমিল দেখা যাবে। এই সিনেমায় বাস্তব-কল্পনা মিশ্রণ শিল্প নির্দেশনা করা হয়েছে।

যার কাছে টাকার কোন মূল্য নেই অর্থাৎ যিনি মনে করেন যে টাকা দিয়ে সব কিছু স করা সম্ভব তার বাড়িতে নতুন কেউ আগমন করবে তার উপলক্ষে সিঁড়িতেও ফুল ছিটানো হচ্ছে যা পাত্রের আয় হিসেব যথার্থ কিন্তু অতি রঞ্জিত হিসেবে দেখানো হয়েছে। যা অনেকটা অবাস্তবতা প্রকাশ করে।



সিনেমায় শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবার বুঝাতে নীলার পরিবারকে বুঝানো হয়েছে। দুর্ঘটনায় পা হারানো বাবার সংসারে মেয়ে কলেজে পড়ে। এক সময়ের আয়-উপার্জনক্ষম কিন্তু বর্তমানে উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তির পরিবারের সেট ডিজাইন দেখানো হয়েছে।

সেট ডিজাইন ও লোকেশন: লোকেশন বলতে শহুরে বুঝানো হয়েছে এবং সেট চার দেয়াল বিশিষ্ট। সেট ডিজাইন পাত্র-পাত্রীর আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই করা হয়েছে যেখানে একতলা পাঁকা বাড়ি, তার সাথে কাঠের দরজা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রপ্স এবং ব্যবহৃত সামগ্রী: সৌখিনতা প্রকাশের জন্য বাড়ির দেয়ালে এবং বারান্দায় নানান প্রপ্স ব্যবহার করা হচ্ছে। যা বাস্তবতা ও কাল্পনিক মিশ্রণ দেখানো হয়েছে। আয় অনুযায়ী দার-দেনা করে চলা পরিবার এতোটা সৌখিতায় জীবন যাপন করা সম্ভব না। তাছাড়া কাঠের চেয়ার, দেয়ালে স্বল্প মূল্যের ওয়ালমেট ব্যবহার করা হয়েছে তা গল্পের মেজাজ পাত্র-পাত্রীর আয় অনুযায়ী ঠিক আছে। এবং সময়কে ঠিক সময়কে নির্দেশ করেছে। ৯০ দশকের শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের এমন চিত্র দেখা যেত।

রঙ ও টেক্সচার-আলোকসম্পাদন: মধ্যবিত্ত পরিবারের কোন টানাপোড়েন নেই এমন সামান্যটা রঙের ব্যবহার করা হয়েছে। এবং বিশেষ কোন অর্থ প্রকাশের জন্য কোন টেক্সচার ব্যবহার করা হয়নি। যা গল্পের সাথে মিল রয়েছে। তবে আলোকসম্পাদন এ রাতের সিনে একটু নীলচে হয়েছে যা কিছুটা টানাপোড়েন আছে এমন পরিবেশ নির্দেশ করে। ছবিটিতে পাত্র-পাত্রীর অবস্থা নির্দেশ করতে এমন আলোকসম্পাদন করা হয়েছে।



এই ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে প্রপ্স হিসেবে ড্রয়িং টেবিল সাথে কিছু প্রসাধনী এবং শোয়ার জন্য চৌকি রাখা আছে। ঘরের ভিতরের সাথে বাহিরের দৃশ্যের পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্যতার কিছুটা বিদ্বিত হয়েছে। কারণ সৌখিনতা প্রকাশে ঘরের বারান্দার পাশে যেসকল গাছ ব্যবহার করা হয়েছে তার স্থায়ী মূল্য এবং পরিচর্যা মূল্য বেশ। যদি সেরকম আয় থাকতো তাহলে সুবার ঘরে অন্তত একটি ভালো মানের খাট পাতা থাকতো। উপরে উল্লিখিত তথ্য উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে এই মর্মে ব্যাখ্যা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রতিয়মান হয়।

চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

শিল্প নির্দেশনা মূলত চলচ্চিত্রের ভিজ্যুয়াল ভাষা নির্মাণের একটি প্রধান উপাদান, যেখানে সেট, লোকেশন, রঙ, প্রপ্স, আলোকসম্পাত, টেক্সচার ও আবসহ সবকিছু গল্প ও চরিত্রের সাথে সমন্বিত হয়। অন্ধ বিশ্বাস সিনেমার শিল্প নির্দেশনায় স্পষ্টভাবে দ্বৈত জীবনধারা ও সামাজিক বৈপরীত্যকে তুলে ধরা হয়েছে। একদিকে বিত্তশালী রাজা চরিত্র, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত আলম ও নীলা। নিচে শিল্প নির্দেশনার প্রধান দিকগুলো তাত্ত্বিকগত ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

সেট ও লোকেশন ডিজাইন: উচ্চবিত্তদের জীবনের সেট হিসেবে ঘরবাড়ির শোভন, বড় আয়তনের, বিলাসী আসবাব ও সোনালী রঙের ছোঁয়া সমৃদ্ধ। এটি অর্থকেন্দ্রিক মানসিকতা ও উচ্চবিত্ত সংস্কৃতির প্রতীক। শহরের অভিজাত এলাকায় কলকারখানা, নাগরিক সুবিধা এবং বিলাসী জীবনযাপনের ইঙ্গিত শিল্প নির্দেশনায় প্রতিফলিত।

অন্যদিকে মধ্যবিত্ত জীবনের সেট হিসেবে আলম ও নীলার বাড়ি শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতীক একতলা পাকা বাড়ি, কাঠের দরজা, স্বল্পমূল্যের আসবাবপত্র ও ওয়ালম্যাট। এতে ৯০-এর দশকের শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সৌখিনতার (যেমন, বারান্দায় দামী গাছ) উপস্থিতি বাস্তবতার সাথে অসামঞ্জস্য তৈরি করেছে।

রঙ ও টেক্সচার: উজ্জ্বল, সোনালী ও উষ্ণ রঙের আধিক্যতা অর্থ, ক্ষমতা ও অহংকারকে প্রতিফলিত করে। দেয়ালের লালচে টেক্সচার একদিকে বেদনা ও দুঃখ, অন্যদিকে আভিজাত্যের প্রতীক। নরম, প্রাকৃতিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রঙ ব্যবহার, যা মানবিকতা, পেম ও সরলতার প্রতিফলন। রাতের দৃশ্যে নীলচে আলো টানাপোড়েন বা মানসিক সংকট নির্দেশ করে।

প্রপ্স ও ব্যবহৃত সামগ্রী: রাজার ড্রয়িং রুমে আধুনিক ফার্নিচার, সোনার অলংকার, মূর্তি, চিত্রকলা ইত্যাদি রাখা হয়েছে। হাতে মদের বোতল চরিত্রের ভোগবাদী মনোভাব ও অর্থকেন্দ্রিক আসক্তিকে ফুটিয়ে তুলেছে। কাঠের চেয়ার, স্বল্পমূল্যের ওয়ালম্যাট, চৌকি, সাধারণ প্রসাধনী সবই সীমিত আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে সৌখিন গাছপালা বাস্তবতাকে কিছুটা ভেঙে দিয়েছে।

আলোকসম্পাত ও আলো-ছায়ার ব্যবহার: নীলাভ আলো ও অন্ধকার ব্যবহার করে দারিদ্র্য ও মানসিক কষ্ট ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ছায়া চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্বের প্রতীক। সংকীর্ণ স্থান, মৃদু আলো ও ছায়া নাটকীয়তা বাড়িয়েছে। উন্মুক্ত স্থান, প্রাকৃতিক আলো ও নরম রঙ ব্যবহার দৃশ্যকে উজ্জ্বল করেছে।

বাস্তবতা বনাম কল্পনার দ্বন্দ্ব: বাড়িতে কারও আগমন উপলক্ষ্যে ফুল ছিটানো, বেলুন, ব্যয়বহুল উপহার ইত্যাদি অতিরঞ্জিতভাবে দেখানো হয়েছে, যা বাস্তবতার সাথে পুরোপুরি খাপ খায় না। আবার, মধ্যবিত্ত পরিবারে দামী গাছের ব্যবহারও কিছুটা অযৌক্তিক। ফলে, শিল্প নির্দেশনা একদিকে বাস্তববাদী, অন্যদিকে কল্পনা-প্রধান মেলোড্রামাটিক রূপ ধারণ করেছে।

তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট: André Bazin-Gi Realism ধারণা অনুযায়ী, শিল্প নির্দেশনা এখানে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসকে বাস্তবতাবাদীভাবে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট, তবে কিছু জায়গায় মেলোড্রামাটিক অতিরঞ্জনও লক্ষ করা যায়। Sergei Eisenstein-Gi Color Symbolism তত্ত্ব অনুযায়ী, রঙকে এখানে প্রতীকীভাবে ব্যবহৃত করা হয়েছে যেখানে সোনালী অর্থোও প্রতীক, আর নীল-ধূসর দুঃখ ও দারিদ্রের প্রতীক। David Bordwell-Gi Narrative Space ধারণা অনুসারে, প্রপস কেবলমাত্র দৃশ্যের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য নয়, বরং চরিত্রের সামাজিক অবস্থান ও মানসিকতার প্রতিফলন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। German Expressionism-এর প্রভাব এখানে স্পষ্টত বিশেষ করে ছায়ার প্রতীকী ব্যবহার, যা চরিত্রের মানসিক টানাপোড়েনকে প্রতিফলিত করে।

সুতরাং অন্ধ বিশ্বাস সিনেমার শিল্প নির্দেশনা সামাজিক বৈপরীত্য, চরিত্রের মানসিক অবস্থা ও গল্পের আবহকে ভিজুয়ালভাবে প্রতিফলিত করেছে। বিলাসিতা বনাম সরলতা, বাস্তবতা বনাম কল্পনা, এবং আলোক-ছায়ার ব্যবহারের মাধ্যমে এটি এক ধরনের প্রতীকী ভাষা নির্মাণ করেছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন বাস্তবতাকে ভেঙে দিয়েছে, যা শিল্প নির্দেশনার এক প্রকার সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে। কারণ শিল্প নির্দেশনার অর্থ হলো চলচ্চিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে গড়ে তোলা। সেই বিশ্বাস চলচ্চিত্রে প্রধান প্রধান চরিত্রের আয়-ব্যয়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সময়কে প্রতিনিধিত্ব হলেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে।

মনের মানুষ চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত কাহিনী: যৌথ প্রযোজনায় লালন ফকিরের বিষয়ক ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র মনের মানুষ (২০১০) নিমাণ করেন ভারতীয় পরিচালক গৌতম ঘোষ। মনের মানুষ সিনেমা লালন বিষয়ক কিন্তু লালন জীবন নির্ভর নয়। লালনের ধর্ম হলো মানবতা। চলচ্চিত্রে লালন ফকিরের জীবনবোধ তুলে ধরার পাশাপাশি তার অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। চলচ্চিত্রের কাহিনী সংক্ষেপ হলো চলচ্চিত্রে বৃদ্ধ লালন গিয়েছেন জমিদার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। জমিদার তার প্রতিকৃতি আঁকতে আঁকতে লালনের গান শুনছেন, আর সেই ফাঁকে লালন নিজের কৈশোর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত জীবনের গল্প বলতে থাকেন। কৈশোরে লালনকে কবিরাজ কৃষ্ণপ্রসন্নের সামনে ধরা হয় ঘোড়া চুরির অভিযোগে। পরে জানা যায়, স্ত্রীকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে রাতে ঘুরতে বের হতসে। কবিরাজ তার গান ও স্বভাব দেখে স্নেহ করেন এবং গঙ্গাস্নানে নিয়ে যান। কিন্তু গঙ্গাস্নানের সময় লালনের গুটি বসন্ত হয়। মৃত ভেবে তাকে ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তখন মুসলমান নারী রাবেয়া তাকে উদ্ধার করে সেবা করেন। লালন তাকে মায়ের আসন দেয়। পরে গুরু সিরাজ সাঁইয়ের সান্নিধ্যে আসে লালন। গুরু তাকে আগের পরিচয়ে না ফেরার আদেশ দেন। কিন্তু সে ঘরে ফিরলে মা তাকে বর্জন করে, কারণ মুসলমানের হাতে ভাত খাওয়ায় তার জাত গেছে। ব্যথিত লালন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এরপর বনে তার পরিচয় হয় কালুয়া ওরফে সোলেমান পাগলার সাথে। ধীরে ধীরে তাদের আশ্রমে নানা ঘরহারা মানুষ এসে জড়ো হয়, আখড়ার নাম হয় আনন্দবাজার। লালনের গান ও আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে। কাঙাল হরিনাথ ও মীর মোশাররফ হোসেন আসেন তার গান

শুনতে। হরিনাথের পরামর্শে লালন শিষ্যদের সংগঠিত করে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শেখায়। একসময় হিন্দু পুরোহিত ও মুসলিম মোল-ারা লালনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। বিতর্কে পরাস্ত হয়ে তারা আক্রমণ চালায়, এতে কালুয়া নিহত হয়। জমিদার দোষীদের শাস্তি দিতে চাইলে লালন ক্ষমা করে দেন। শেষে লালন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গগন হরকরার বাড়ি যায়। সেখানে সে গান করে ড় “মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে”। আর মনের মানুষের সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা দিয়েই দশক নন্দিক চলচ্চিত্রটির সমাপ্তি হয়।

মনের মানুষ চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনা:

শিল্প নির্দেশনা চলচ্চিত্রের দৃশ্যমনতার ও ভাষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি শুধু চরিত্র ও গল্পের পটভূমি তৈরি করে না, বরং চলচ্চিত্রের সমাজ-সংস্কৃতি, দর্শন ও প্রতীকী অর্থকে দৃশ্যমান করে তোলে। গৌতম ঘোষ পরিচালিত মনের মানুষ (২০০৯) চলচ্চিত্রে ফকির লালন শাহের জীবন ও দর্শনের ভিজ্যুয়াল পুনর্নির্মাণ। চলচ্চিত্রটির শিল্প নির্দেশনা ইতিহাস, দর্শন ও প্রতীকীবাদের সমন্বয়ে একটি অনন্য চিত্রভাষা তৈরি করেছে।

সেট ডিজাইন ও লোকেশন নির্বাচন: লালনের মৃত্যুর সময়কাল (১৮৮৪-১৮৮৬) কে প্রেক্ষাপট হিসেবে ধরা হয়েছে। নির্মাতা এখানে সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছনের ঘর ব্যবহার করেছেন, কারণ টিনের প্রচলন হয়েছিল মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। এছাড়া লালনের ঘরকে টং ঘর হিসেবে দেখানো হয়, যা চারপাশের জলমগ্ন পরিবেশ ও হিংস্র জন্তুর ভয় থেকে বাঁচার প্রতীকী বাস্তবতাকে তুলে ধরে। ছবির কিছু অংশ টাঙুয়ার হাওরে শুট করা হয় যেখানে বিদ্যুতের থাম নেই, ফলে সময় ও পরিবেশের প্রামাণ্যতা আরও জোরদার হয়েছে। এছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাসাদ ও বাড়ি নির্মাণে উচ্চ ছাদ, প্রশস্ত বারান্দা, দেয়ালে অলঙ্কারশোভিত খোদাই, আরামকেদারা ও তেলের বাতির মৃদু আলো ব্যবহার করা হয়েছে। এটি ইউরোপীয় প্রভাবিত জমিদারী ঐশ্বর্যের প্রতীক।



লালনের আখড়া: একটি বনের ভেতর বাঁশ, মাটির ঘর, ঘড়ের ছাউনি ও খোলা উঠোনে গড়ে ওঠা আখড়ায় সহজ-সরল জীবনধারার ছাপ রয়েছে। মাটির কুঁড়েঘর, গ্রামীণ রান্নাঘর, লাঠি ও দোতরা ঝোলানো দৃশ্য আখড়াটিকে একটি আধ্যাত্মিক-গণতান্ত্রিক আশ্রমে রূপ দিয়েছে।

আউটডোর লোকেশন বা পরিবেশ: গঙ্গার ঘাট, মেলার মাঠ, খোলা আকাশের নিচে দোহার গান সবগুলো লোকেশন নির্বাচন দর্শককে উনবিংশ শতকের বাংলার ভেতর টেনে নিয়ে যায়।



প্রসঙ্গ ও ব্যবহৃত সামগ্রী: লালনের দোতরা, একতারা, লাঠি তার জীবনদর্শন ও শিল্পচর্চার প্রতীক। কবিরাজ কৃষ্ণপ্রসন্নের ঘোড়া রাণী শুধু পরিবহন নয়, বরং লালনের যৌবনের রোমান্টিক আবেগ ও স্বাধীনচেতা মানসিকতার প্রতীক। জমিদার বাড়ির আসরে ব্যবহার করা হয়েছে পিতলের কেরোসিন বাতি, মাদুর, গালিচা যা পরিবেশের প্রামাণিকতা বজায় রেখেছে। মুসলমান নারী রাবেয়ার ঔষধি গাছ, হাড়ি-পাতিল ও প্রসাধন সামগ্রী তার ধাত্রীবিদ্যার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট প্রকাশ করে।

রঙ ও আলোকসজ্জা: আখড়ায় প্রাকৃতিক আলো, মাটির রঙ, সবুজ বনের ব্যবহার যা সরলতার প্রতীক। জমিদার বাড়িতে হলুদ ও সোনালি আলোর প্রাচুর্য-ধনাঢ্য ও ক্ষমতাশালী জীবনযাত্রার প্রতিফলন। ধর্মীয় শেষকৃত্যে অন্ধকার, ধোঁয়া, লালচে আগুন হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুরতার প্রতীকী চিত্র। আর ‘মিলন হবে কত দিনে’ গানের সাথে সাথে গোধূলির আলো, ধূসর-নীল আকাশ অন্ত মিলনের আকাঙ্ক্ষার চিত্রায়ণ।

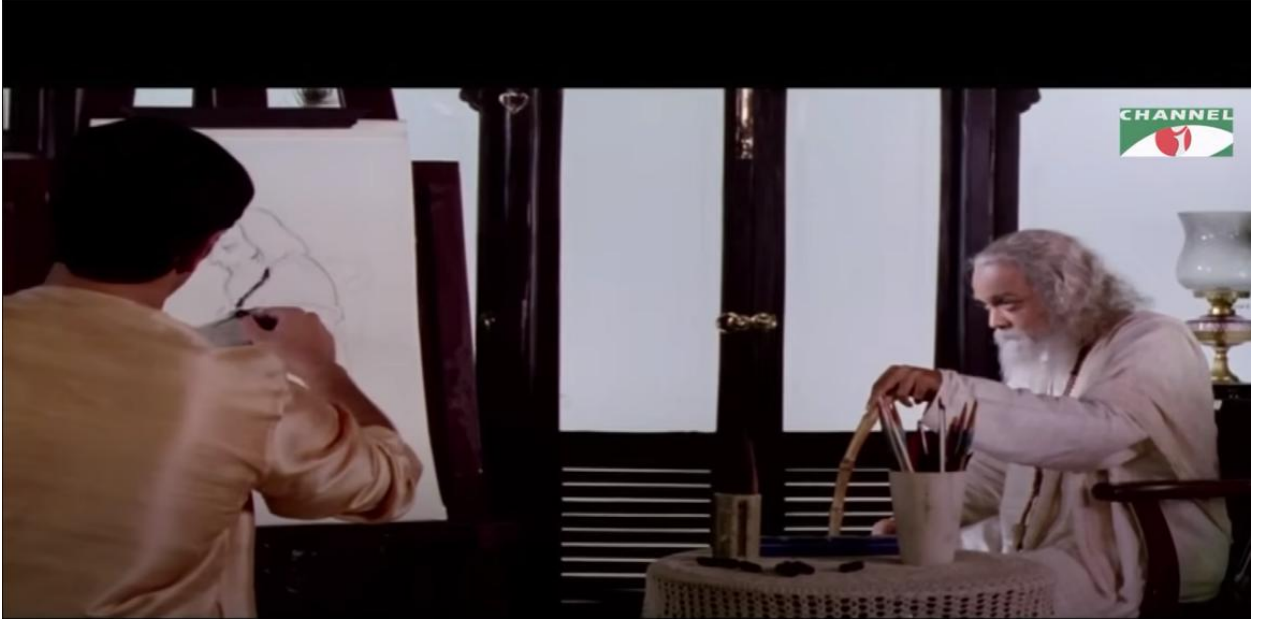
সময় ও কালচারের প্রত্ন শ্রদ্ধা: চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনা লালনের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের সময়ভিত্তিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছে। গ্রামবাংলার লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে যুক্ত শিল্পপ্রয়োগ যেমন মাটির পাত্র, গরুর চরন ইত্যাদি নান্দনিকভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে।



চরিত্রের আবেগ প্রকাশ: লালনের যন্ত্রণার সময় তার পরিবেশ বিশেষভাবে বিষন্ন ও নিঃসঙ্গ দেখানো হয়েছে। বধূ রাবেয়ার সংরক্ষণ ও সেবার দৃশ্যগুলিতে গৃহময় ও মানবিক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে সংবেদনশীলতা জাগানো হয়েছে। আখড়ার দল ও বিপ্লবী মুহূর্তগুলোতে পরিবেশটি চরম নাটকীয়তার সঙ্গে উপস্থাপিত। সুতরাং বলা যায়, মনের মানুষ চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা কেবল ঐতিহাসিক বাস্তবতার পুনর্নির্মাণ নয়, বরং প্রতীকী উপস্থাপনা ও ভিজ্যুয়াল নন্দনশৈলীর মাধ্যমে লালনের দর্শনকে ফুটিয়ে তুলেছে। এর মাধ্যমে গৌতম ঘোষের নির্দেশনায় মহিউদ্দিন ফারুক একটি বিশ্বাসযোগ্য ভিজ্যুয়াল জগৎ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, যা দর্শককে উনিশ শতকের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির অভিজ্ঞতায় নিমজ্জিত করে। শিল্প নির্দেশনার বিশ্বাসযোগ্যতা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ড প্রথমে ভেবেছিল দৃশ্যগুলো হয়তো বাস্তব কোনো স্থানে ধারণ করা হয়েছে। পরে তাঁরা শিল্প নির্দেশনার সৃজনশীলতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং পুরস্কৃত করে।

দৃশ্যাবলী অনুযায়ী শিল্প নির্দেশনা: প্রথম দৃশ্য দেখা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনকে স্কেচ করছেন। সেই দৃশ্যের শিল্প নির্দেশনা এরূপ।

সেট ডিজাইন: ঠাকুরের নৌকা (বোজরা) খুবই শোভনভাবে সাজানো ও পালিশ করা কাঠ, জটিল খোদাই, এবং মোমবাতির আলো দ্বারা আলোকিত ইন্টেরিয়র। এই বিলাসবহুল পরিবেশ লালনের সহজ-সরল জীবনধারার সঙ্গে তীব্র বৈপরীত্য সৃষ্টি করে, যা ভিজ্যুয়ালি ধনী সম্পদ বনাম আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি নিয়ে থিম্যাটিক বিতর্কের সূচনা করে। বিলাসিতা ঠাকুরের জ্ঞানপিপাসা ও কৌতূহলকে আরও জোর দেয়, সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য সত্ত্বেও লালনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।



নদীর পাশে লালনের কৈশোর:

সেট ডিজাইন ও লোকেশন: কাদামাটি দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘর, বাঁশের বেড়া এবং নদীর তীরে সরু উদ্ভিদসমূহ গ্রামীণ
বাংলার পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলে।



নদী নিজে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিস-অ'-সিন স্থাপনায় পরিণত হয়। বইতে থাকা নদীর স্রোত লালনের জীবনপথ, অস্থায়ী এবং তরল দর্শনের প্রতীক। ছোটফরাস থেকে বেঁচে থাকার পর লালনের রক্ষা ও লালন-পালনের ঘটনাও পুনর্জন্মের প্রতীক হিসেবে ফুটে ওঠে। পরিবেশের সরলতা দুর্বলতা, বিনয় ও আধ্যাত্মিক জাগরণের অনুভূতি প্রজ্বলিত করে।



লালনের আখাড়া: সেট ডিজাইন: খোলা আঙিনা, কাদামাটি মাটির তলা, বাঁশের খুঁটি এবং খড়ের ছাদ এক ধরনের সাম্প্রদায়িক, ধ্যানময় স্থান তৈরি করে। বাদ্যযন্ত্র ও ছোট পূজার স্থান সতর্কভাবে স্থাপন করা হয়েছে। প্রদর্শনীর সঙ্গে

একীকরণ করতে এই স্থান গোষ্ঠীভাবে গান, নৃত্য এবং দার্শনিক আলাপের জন্য উপযুক্ত, তাই সেট যেন জীবন্ত চরিত্রে পরিণত হয়।



আখাড়া লালনের সমতামূলক দর্শনের প্রতিফলন যে কেউ হোক না কেন, বর্ণ বা ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে স্বাগত জানানো হয়। নূনতম ডিজাইন ভৌতবস্তুতে নির্ভরতা না করার বার্তা দেয়।



চাঁদনি রাতে নদী দৃশ্য : ভিজুয়াল ডিজাইন-নদী পুরো চাঁদের আলোয় আলোকিত, জলের ওপর প্রতিফলন বালমল করছে। কিছু নৌকা এবং পানকৌগি দৃশ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাড়াচ্ছে। নরম আলোকসজ্জা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্যান, আধ্যাত্মিক উত্তরণ এবং লালনের প্রকৃতির সঙ্গে মিলনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপ এবং সূক্ষ্ম সেট ড্রেসিংয়ের সংমিশ্রণ ঘোষের সিনেমাটোগ্রাফির কাব্যিক গুণমানকে আরও সমৃদ্ধ করে।



নারীদের বাউল গান প্রদর্শনী: নারীরা খোলা আঙিনায় গান গাইছে, পটভূমিতে পুরুষেরা খুঁটিতে দাঁড়িয়ে আছে। বাতি, বাদ্যযন্ত্র এবং নৌকা কৌশলে স্থাপন করা হয়েছে। মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা নারী ও উঁচুতে অবস্থানকারী পুরুষের পার্থক্য সামাজিক স্তরকে চিত্রায়িত করে, তবে সঙ্গীতের মাধ্যমে এই বিভাজন ম্লান হয়ে যায়। শিল্প নির্দেশনা লালনের দর্শনের অন্তর্ভুক্তমূলক দিককে সমর্থন করে সঙ্গীত সামাজিক ও ধর্মীয় বাধা পেরিয়ে মানুষের সংযোগ স্থাপন করে।



ঠাকুর-লালন বিতর্ক: প্রারম্ভিক দৃশ্যের মতো বিলাসবহুল নৌকার ইন্টেরিয়র, এখন দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যায় বৃদ্ধ, সরল পোশাকে লালন। এই বৈপরীত্য আধ্যাত্মিক বনাম ভৌত ধন-সম্পদের পার্থক্যকে তুলে ধরে। লালনের

উপস্থিতি ও করিশমা বিলাসিতাকে দার্শনিক চর্চার স্থান হিসেবে রূপান্তরিত করে।



এই সেট লালনের জীবনের সমাপনী পর্যায়কে সমর্থন করে তার ধারণা ও জীবনের অভিজ্ঞতা ভৌত সৌন্দর্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে।



সুতরাং এই দৃশ্যগুলিতে মহিউদ্দীন ফারুক ও সামির চন্দ্র শারীরিক স্থানকে ভিজুয়াল প্রতীক হিসেবে রূপান্তরিত করে। নদী, আঙিনা, নৌকা এবং চাঁদনি রাতের দৃশ্য লালনের আধ্যাত্মিক যাত্রা, সমতামূলক দর্শন এবং মানবিকতা প্রতিফলিত করে। প্রতিটি সেট ঐতিহাসিকভাবে যথাযথ এবং কাহিনীর জন্য কার্যকর, ফলে ভিজুয়াল ডিজাইন কেবল পটভূমি নয়, বরং গল্প বলার একটি গুরুপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।

তাত্ত্বিকগত বিশ্লেষণ:

মিজ-আঁ-সেন: চলচ্চিত্রতত্ত্বে মিজ-আঁ-সেন বলতে বোঝায় ক্যামেরার সামনে দৃশ্য বিন্যাস। যেমন সেট, লোকেশন, প্রপস, পোশাক, আলো ও রঙের সমন্বিত ব্যবহার। মনের মানুষ চলচ্চিত্রে প্রতিটি উপাদান লালনের দর্শন ও সামাজিক বাস্তবতাকে প্রতীকায়িত করেছে। জমিদারবাড়ির সোনালি আলো ও ইউরোপীয় আসবাব উপনিবেশিক আধিপত্য ও সামন্ততান্ত্রিক ঐশ্বর্যকে তুলে ধরে। আখড়ার প্রাকৃতিক আলো ও মাটির পরিবেশ নিপীড়িতদের আশ্রয়স্থল হিসেবে মানব ধর্মের ভিজ্যুয়াল রূপক তৈরি করেছে। এখানে অ্যাপারটাস তত্ত্বের আলোচনায় বলা যায়, দৃশ্য বিন্যাস শুধু বাস্তবতার অনুকরণ নয়, বরং মতাদর্শ নির্মাণের মাধ্যম।

মনের মানুষ চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা মূলত তিনটি স্তরে মাধ্যমে কাজ করেছে:

ঐতিহাসিক পুনর্নির্মাণ: লালনের জীবন ও সময় কাল (১৮৮৪-১৮৮৬) অনুযায়ী ঘর, বসত, পোশাক এবং যন্ত্রপাতি সাজানো হয়েছে। যেমন: লালনের টং ঘর, আখড়া, নদীর পাড়।

প্রতীকী উপস্থাপনা: নদী, আখড়ার খোলা আঙিনা, চাঁদনি রাতের দৃশ্যগুলো কেবল স্থান নয়, বরং আধ্যাত্মিকতা, পুনর্জন্ম এবং সমতাবাদী দর্শনের প্রতীক।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভাষা: জমিদার বাড়ির বিলাসিতা, আখড়ার সরলতা, নারীদের বাউল গান-এসব দৃশ্য দর্শককে ১৯শ শতকের বাংলার সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির মধ্যে ডুবিয়ে দেয়।

প্রতীকী ও নান্দনিক স্তর: খোলা আঙিনা, বাঁশের খুঁটি, খড়ের ছাদ-সবই লালনের সহজ জীবনধারার প্রতিফলন। এখানে নূনতম ভৌত বস্তু ব্যবহার করে মানবিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নদী লালনের জীবনপথের অস্থায়িত্ব, প্রবাহমান দর্শন এবং মানবিকতার প্রতীক। ছোটফল্ল থেকে বাঁচার গল্প নদীর চলমান চরিত্রের সঙ্গে মিলে যায়। ঠাকুরের নৌকা (বোজরা): বিলাসবহুল, European প্রভাবিত প্রাসাদ এবং নৌকা লালনের সরল জীবনধারার বিপরীত এবং আধ্যাত্মিক বনাম ভৌত সম্পদের দ্বন্দ্ব দেখায়।

সময় ও সংস্কৃতির সংযোজন: শিল্প নির্দেশনা কেবল স্থাপত্য বা সাজসজ্জা নয়, এটি গ্রামীণ বাংলার ঐতিহ্য ও সমাজের সাথে মিলিয়ে কাহিনীর সময় ভিত্তিক বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করে। উদাহরণ: মাটির পাত্র, গরুর চরন, কুঁড়েঘর লোকজ জীবনধারার প্রতিনিধিত্ব। জমিদার বাড়ির মাদুর, গালিচা, পিতলের কেরোসিন বাতি ঐশ্বর্যের প্রকাশ। ধর্মীয় চূড়ান্ত দৃশ্যে ধোঁয়া ও লালচে আগুন হিন্দু সমাজের কটরতা ও অন্ধকারের প্রতীক। মনের মানুষ চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা কেবল দৃশ্যের পটভূমি নয়, বরং এটি গল্পের আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও প্রতীকী স্তরকে দৃশ্যমান করে।

ঘ) গোর চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত কাহিনী: গাজী রাকায়েত পরিচালিত 'গোর' (২০২০) চলচ্চিত্র ১১টি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। তার মধ্যে একটি হলো শিল্প নির্দেশনায়। সেই সাথে এটিই প্রথম কোন সিনেমা যা

হলিউডে মুক্তি পেয়েছে ইংরেজি ভাষায়। আবার এটি ইংরেজি ভাষার কোন প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা সিনেমা। এই সিনেমার গল্প সংক্ষেপন হলো- শিরজা মিয়া (কাজী রাকায়ত) মিয়া একজন কবর খোঁড়ার মানুষ। তিনি গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়ান মৃত্যুর খবর জানার জন্য। এখন তার জীবনে আছে শুধু দুটি জিনিস। একটি হলো পুতুল, যা তিনি তার মেয়ের জন্য কিনেছিলেন, আর অন্যটি হলো একটি সংখ্যা, যা তিনি তার পূর্ব পরুষদের কাছ থেকে পেয়েছেন। তার পূর্বপরুষদের বিশ্বাস ছিল, কেউ যদি একশোটি কবর খুঁড়তে পারে তবে সে নিশ্চিতভাবে স্বর্গ লাভ করবে। কিন্তু কখনো কেউ সেই লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি। যখন শিরজা যুবক ছিলেন, তখন তিনি এক চরে এসে বিয়ে করেন। তাদের একটি স্নেহময়ী কন্যা জন্মায়, নাম রাখা হয় রাহেলা। কাজের জন্য সিরাজকে শহরে যেতে হয়। যাওয়ার সময় রাহেলা বাবার কাছে শহর থেকে একটি পুতুল চেয়ে নেয়। একদিন শিরজা একটি পুতুল কিনে ফেরার পথে খারাপ আবহাওয়ার কারণে চরটিতে আর ফিরতে পারেননি। পরদিন তিনি খবর পান যে জলোচ্ছ্বাসে পুরো চরটি ভেসে গেছে। পরে তিনি চরটিতে ফিরে আসেন। কিন্তু কোথাও তার মেয়ে কিংবা স্ত্রীকে খুঁজে পাননি। চরটি ভরে গিয়েছিল লাশে। সেই সময় থেকে তিনি কবর খোঁড়া শুরু করেন। যখন তার একশো কবর পূর্ণ হতে আর মাত্র একটি বাকি, তখনই তিনি নিজের মেয়ের মতো দেখতে এক মেয়েকে নিয়ে বড় সংকটে পড়ে যান। মেয়েটি অসুস্থ থাকে প্রায়ই এবং এই অসুস্থতার জন্য সিরাজকে দায়ী করে মেয়ের পরিবার। এই অপবাদের কথা শুনে গোর খোদক নিজেই ধান ক্ষেতের পাশে উঁচু জমিতে নিজের কবর খোঁড়ার জন্য যায় এবং অল্প কবর খোঁড়লেই সিরাজ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এভাবেই কাহিনী সমাপ্ত হয়।

ঙ) গোর সিনেমার শিল্প নির্দেশনা: আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত ‘গোর’ বাংলা সিনেমার শিল্প নির্দেশনার কাজ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই সিনেমাটি অস্কারের জন্য পাঠানো হলে ভোটভোটিতে হেরে যায়। এই চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নির্মিত। শিরজা মিয়ার জীবনের যন্ত্রণার প্রতিফলন এবং চর কাহিনীর আবহে শিল্প নির্দেশকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নিচে মূল কিছু দিক তুলে ধরা হলো:

সেট ডিজাইন ও লোকেশন: চর এবং গ্রামাঞ্চলের ভাবনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রীতি মতো প্রাকৃতিক এবং বস্তুনিষ্ঠ পরিবেশের মাধ্যমে, যা গল্পের মর্মস্পর্শী বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে তোলে। চরে অবস্থিত ঘর বাড়ি জলোচ্ছ্বাসের আঘাতের পর, ভাঙা চর, ভেসে যাওয়া মানুষের লাশ, ভেঙ্গে যাওয়া বা উপড়ে ওঠা গাছ, লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়া বাড়ি ঘর প্রভৃতি দৃশ্য নদীর পাশে সম্পূর্ণ নির্মিত পরিবেশ যা শিল্প নির্দেশনায় বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট পটভূমির প্রয়োজন যা দর্শকের মনে এক দৃষ্টিনন্দন এবং করুণ অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। ধানক্ষেতের পাশে উঁচু জমি, কবর খোঁড়ার স্থানগুলোর যথাযথ ডিজাইন গল্পের ক্লাইম্যাক্সের আবহ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রপস ও বস্তুচিত্র: শিরজার কাছে থাকা পুতুলটি কেবল একটা বস্তু নয়, এটি গল্পের আবেগ এবং স্মৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। এই পুতুলের নান্দনিক বিন্যাস এবং তার যত্নশীল প্রদর্শন শিল্প নির্দেশকের দক্ষতার পরিচয় দেয়। কবর খোঁড়ার সরঞ্জাম, শিরজার হাতে থাকা কারুকার্যন খচিত লাঠি, প্রভৃতি সব কিছু প্রাকৃতিক এবং কাহিনীর বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাখা হয়েছে।

রঙ ও আলোকসম্পাদন: গল্পে মেজাজের সাথে সঙ্গতি রেখে রঙ-টেক্সচার এবং আলোক সম্পাদন করতে হয়। এই গল্পে টোন-মেজাজ হচ্ছে করুণ তাই বাড়ির রঙ, মাটির রঙ এ শেড ব্যবহার করে চরাঞ্চলের ছেলে নারীর জীবনযাত্রার কঠিনতা তুলে ধরা হয়েছে। জলোচ্ছ্বাসের সময়, কবর খোঁড়ার সময় এবং অসুস্থ মেয়ের দৃশ্যে আলোর নান্দিক পরিবর্তন গল্পের আবেগ ও থ্রিলিং অবস্থা প্রকাশ করে।

চরিত্রের সাজসজ্জা ও পোশাক: যদিও পোশাক সরাসরি শিল্প নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তবু গল্পের পুরোপুরি মেজাজ ধরতে হলে পোশাক ও সাজসজ্জা সম্পর্কে আলাপ করতে হবে। শিরজার পোশাক সাধারণ কিন্তু সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত দিয়ে তার বাসস্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। মেয়ের অসুস্থতা, অশান্তি ও তার পরিবার থেকে অপবাদ পাওয়া এগুলো শিল্প নির্দেশনায় পোশাক ও সাজসজ্জার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতীক: একশোটি কবর খোঁড়ার বিশ্বাস এবং লোককথার এই উপাদানটি সিনেমার থিম্যাটিক ও ভিজুয়াল ভাষায় গভীর ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ জীবনযাত্রার উপাদান, চরাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত ডিটেইলস শিল্প নির্দেশনায় সুক্ষ্মভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

অনুভূতিবিহীনতা এবং বাস্তবতা: শিল্প নির্দেশক এখানে অতিরঞ্জিত কিংবা সাজানো পরিবেশ থেকে বিরত থেকে চরিত্র ও প্লটের মাধ্যমে বাস্তবতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন। সিনেমার শিল্প নির্দেশনা মূলত চরিত্রের যন্ত্রণা, গ্রামের কষ্ট ও বিশ্বাসকে বাস্তবসিদ্ধ করার মাধ্যমে গল্পের আবেগকে দৃশ্যমান করে তুলেছে, যা দর্শকের মধ্যে তীব্র সংবেদন জাগায় এবং গল্পটিকে স্মরণীয় করে রাখে। গোর চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা করে। যেখানে শিরজার পরিবার, সোবার পরিবার, মোজা ও অর্চনার বাড়ি-ঘর ইত্যাদি। চরাঞ্চলে অবস্থিত শিরজার ঘর-ঘরের আঙিনা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে নির্মাণ করা হয়েছে। নদী তীরবর্তী অঞ্চল চরের ঘর বাড়ি সাধারণত নিম্নমানের উপাদান দিয়ে তৈরি হয়। কারণ ঝড়-জলোচ্ছ্বাস হলে সব উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাই এই সিনেমায় শিরজার বাড়ি নির্মাণে বাশ, খড়কোটো, শোলা প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে।



সেট ডিজাইন ও প্রসঙ্গ: ছবির স্ক্রিনশটে দেখা যাচ্ছে যে একটি বাড়ি যা সিনেমা শ্যুটের জন্যই নির্মাণ করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ তথ্য বলছে এই বাড়ির জায়গাটি চর-জঙ্গল ছিল যা পরিষ্কার করে বালু মাটিতে বাড়ি তৈরি করার চেষ্টা দেখানো হয়েছে। তবে একটি চর অঞ্চলে ঝড়-জলোচ্ছ্বাস হলেও বাড়ির আশে পাশে গাছপালা থাকতে পারে। সেই দিক থেকে নির্মাণের এই সেটটি কিছুটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। তবে শিল্প নির্দেশক সময়-ব্যয় সাপেক্ষে ভালো কাজ করেছেন। নির্মাণের কিছুদিন পর যদি করা শ্যুটিং করা হতো তাহলেই শতভাগ বিশ্বাসযোগ্য মনে হতো। যেমনটি করে ছিল সূর্যদীঘল বাড়ি সিনেমা নির্মাণের জয়গুণের বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে। পুরোনো বাড়িতে নতুন করে তালগাছে লাগানো হয়েছিল। সেই সাথে গ্রামের একটি বাড়িতে শাক-সবজির গাছ-সবুজায়ন থাকবে এটাই স্বাভাবিক চিত্র। যা উপরের স্ক্রিনশটে অনুপস্থিত। তবে চরের প্রশ্নে কিছুটা ভিন্নতা দেখা দিতে পারে। তবে গবেষক হিসেবে বলব এই দৃশ্যপট নির্মাণে শিল্প নির্দেশক কিছুটা দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে নিচের যে স্ক্রিনশটটি যা ঝড়ের পরের দৃশ্য বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। তা অনেকটা বাস্তবতা নির্দেশ করে। ঝড়ে বাড়ি-ঘর এবং পাশের গাছ, ব্যবহৃত আসবাবপত্র সমূহ বাতাসের সাথে উড়ে অন্যত্র চলে যাবে এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে এটাই সাধারণচিত্র। এই ছবিটিতেও তাই লক্ষ করা যাচ্ছে। কারণ ঝড়ে গাছ ভেঙ্গে পানিতে ভাসছে, মানুষ মরে পড়ে আছে, ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র মাছ ধরার উপকরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যা চিত্রনাট্যের বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়।



তবে এখানেও কিছুটা ঘাটতি রয়েছে বাড়ের পর গাছের যে সকল ডালপালা ভেঙ্গে যায় তার সাথে পাতাও থাকে ...এখানে গাছের পাতা অনুপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। তবে বাড়ের অনেকদিন পরের দৃশ্য হলে প্রশ্ন থাকে না।



যেমন উপরের স্ক্রিনশটটি বাড়ের পরের চিত্র হিসেবে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

রঙ-টেক্সচার ও আলোকসম্পাদন: ঝড়ের পরের দৃশ্যাবলীর রঙ ধূসর-বাদামি হয়। এখানেও তাই রয়েছে। আর টেক্সচার হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ঝড়ের পরে মাটি, আশবাবপত্রে বিভন্ন রকমের টেক্সচার পরে। যেমন ভাঙ্গা গাছের ডালে বন, লতাপাতা প্রভৃতি পড়ে থাকতে পারে। যা এখানে স্পষ্ট হয়েছে। আবার চরিত্রে মানসিক অবস্থা বুঝানোর জন্য আলোকসম্পাদন ব্যবহার করা হয়। এখানেও অস্থিও মানসিক অবস্থা তুলে ধরার জন্য কিছুটা ধূসর বর্ণের আলোকসম্পাদন করা হয়েছে। তবে আরো একটু শ্যাডো হলে ভালো হতে বলে গবেষকের কাছে প্রতীয়মান হয়।

অন্যদিকে গোরখোদক শিরজা যাদের বাড়িতের মৃত্যুও খবর শুনে আসে তারা হলো সোবা। যার বাবা মারা যায়। বাবার উপর অনেক নির্ভরশীল ছিল সোবা। বাবা বাড়ির গবাদি পশু সোবার মেয়ে অথর্থাৎ নাতিন দেখা শোনা করতো যার দরুণ সোবার কোন ধরনের চিন্তা হতা না।



সেট ডিজাইন-প্রপস এবং আলোকসম্পাদন: উপরের স্ক্রিনশটটিতে দেখা যাচ্ছে যে নিম্ন মন্তবিত্ত শ্রেণীর এক কৃষক পরিবারের আবাস। যেখানে বাশ, ছনের বেড়া, মাটির হাড়ি, প্রভৃতি ব্যবহরা করা হয়েছে সেট ডিজাইন ও অর্থ প্রকাশ করতে। সেট ডিজাইন হিসেবে বাস্তবিক মনে হচ্ছে। কারণ নদীর পাড়ের একটি কৃষক পরিবারে ভিটামাটি এরকম ই হয়। হ্যা তবে এই বাড়িটিও পুরোপুরি বাস্তবিক প্রকাশ করছে না। উচ্চ দৃষ্টি দিলে কিছুটা ঘাটতি দেখা যাবে। তবে চলচ্চিত্রের দর্শকের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে নাও হতে পারে। এখানেই শিল্প নির্দেশকরে স্বার্থকতা।



এই স্ক্রিনশট বাড়ির আঙ্গিনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যা শতভাগ প্রাকৃতিক মনে হচ্ছে। দুটো ছবিতেই পুরোনো বাড়ি হিসেবে টেক্সচার এবং রঙ বাস্তবসম্মত কারণ রঙ বিবর্ণ হয়েছে সময়ের পরিক্রমায়।



আবার এই পরিবারের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত আসবাপত্র প্রাকৃতিক বলে বিশ্বাসযোগ্য। কারণ ব্যবহৃত হারিকেন, কাথা-বালিশের ধরন-মান, মলারি-মশারি টাঙ্গানোর পরিবেশ। সব কিছু মিলে বিশ্বাসযোগ্য।



এই ছিনশটিও পরিবারের আর্থিক অনটনের অবস্থা প্রকাশ করে। সীমিত আয়ের পরিবার হিসেবে ব্যবহৃত জিনিসপত্র। যা বাস্তবিকভাবেই ফুটে উঠেছে।



আবার শিরজা আশ্রয়ের ঘরের অবস্থা পরিত্যক্ত ঘরের মতো। এই ঘরটিও বিশ্বাসযোগ্য কারণ এখানে ঘরে অবব্যাহত জিনিসপত্র যা পরিত্যক্ত ঘরেই সাধারণত স্টোর করে রেখে দেওয়া হয়। ঘরের জানালা, চৌকি, হারিকেন প্রভৃতি বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ।



হিন্দু পরিবারের ঘরের যে সেট ডিজাইন হয় অর্থাৎ বিভিন্ন ড্রয়িং ধর্মীয় বিষয়ের জিনিসসমূহ এবং বাড়ির আঙিনাও প্রাকৃতিক পরিবেশকেই প্রকাশ করে।



এই ছবিতেও প্রপস হিসেবে শোলা টানানো, মাছ ধরার ঠোঙা মাটির পাত্র, বাশের, টিনের সমন্বয়ে তৈরিকৃত ঘর এবং ঘরের টেক্সচারের যে ব্যবহার তা হিন্দু ধর্মের অনুসারি পরিবারকে নির্দেশ করে যা চিত্রনাট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সুতরাং গোর চলচ্চিত্রে তিনটি পরিবারের আবাস, আবাসের আঙিনা, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে নির্মিত পশ্চাতপট তৈরি করা হয়েছে যা বাস্তব সম্মত এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। তবে শিরাজ মিয়ার আবাস নিয়ে কিছুটা ভাবভার বিষয় আছে যেখানে শতভাগ প্রাকৃতিক বা বিশ্বাসযোগ্য হবার সম্ভাবনা কম। গোর সিনেমার শিল্প নির্দেশনার দৃষ্টিকোণ থেকে আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের পর তাত্ত্বিকগত ভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলে দেখা যা।

গোর চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

বাস্তবতা বনাম শিল্প সৃষ্টি: চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনার মূল লক্ষ্য হলো বাস্তবতা ও শিল্প সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটানো। 'গোর' চলচ্চিত্রের সেট ডিজাইন ও প্রপস ব্যবহারে গ্রামীণ জীবনের অনটন, চরাঞ্চলের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট, নিম্নবিত্ত কৃষক পরিবারের জীবনযাত্রা ফুটে উঠেছে।

বাস্তবতার সীমাবদ্ধতা: চরাঞ্চলে ঘরবাড়ির চারপাশে গাছপালা থাকার কথা থাকলেও শিল্পনির্দেশনায় তা অনেকটা অনুপস্থিত, যা সেট ডিজাইনের দুর্বলতা নির্দেশ করে।

শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস: স্বল্প সময় ও ব্যয়ের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও শিল্প নির্দেশক দর্শকের কাছে সেটগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এই বিষয়ে নোয়েল বার্চ '(Noël Burch)–Gi Institutional Mode of Representation তত্ত্বকে মনে করিয়ে দেয়, যেখানে বলা হয়েছে সিনেমার ভিজুয়াল গঠন দর্শকের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হয়।

সেট ডিজাইন ও প্রপস: চলচ্চিত্রের সেট ডিজাইন গ্রামীণ বাংলার বাস্তবচিত্র ধারণ করেছে। যেখানে কৃষক পরিবারের ঘর: বাঁশ, ছন, মাটির হাঁড়ি, হারিকেন, কাথুবালাশ সবই নিম্নবিত্ত জীবনযাত্রার প্রতিফলন। পুরনো জানালা, চৌকি, ব্যবহৃত আসবাবপত্র, স্টোর করা জিনিস সবই প্রপস হিসেবে যথাযথ। ধর্মীয় প্রতীকী উপকরণ, শোলা, মাটির পাত্র, বাঁশুটিনের সমন্বয়ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয়ের প্রতিফলন।

এটি মিজ-আঁ-সেন (Mise-en-scène) তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায় যেখানে প্রতিটি প্রপস চরিত্রের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে প্রতীকায়িত করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বিশ্বাসযোগ্যতা: 'গোর' এ বিভিন্ন পরিবারের আবাসের পটভূমি তৈরি হয়েছে গ্রামীণ বাস্তবতার সঙ্গে মিল রেখে। সোবার পরিবারের অর্থনৈতিক অনটনের প্রতিফলন, সীমিত আসবাবপত্র ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র ইত্যাদি। গাছ ভেঙে যাওয়া, মাছ ধরার উপকরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা, মৃতদেহ সবই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার ভিজুয়াল প্রতিফলন। তবে ঝড়ো বাতাসের পরে পাতাহীন ভাঙা ডালের দৃশ্য কিছুটা অবাস্তব মনে হয়েছে, কারণ সাধারণত ভাঙা ডালের সঙ্গে পাতা যুক্ত থাকে। এ দিক থেকে শিল্প নির্দেশনায় সামান্য ঘাটতি দেখা যায়।

রঙ, টেক্সচার ও আলোকসম্পাদন: রঙ: ঝড়ের পরের ধূসর-বাদামি টোন প্রকৃতির ধ্বংস ও মানুষের মানসিক বিপর্যয়কে প্রতিফলিত করে। টেক্সচার: ভাঙা আসবাবপত্র, কাদুমাটি, গাছের ডাল-সবই চরিত্র ও প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মানানসই।

আলোকসম্পাদন: ধূসর আলো ব্যবহার করা হয়েছে চরিত্রের মানসিক অবস্থা বোঝাতে। তবে ছায়া আরেকটু বেশি হলে গভীরতা বাড়ত। এখানে আন্দ্রে বাজার বাস্তবাদী চলচ্চিত্র তত্ত্ব প্রযোজ্য যেখানে বলা হয়েছে আলোছায়া ও রঙ বাস্তবতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে অপরিহার্য।

সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিফলন: 'গোর' এ শিল্প নির্দেশনা কেবল ভৌত পরিবেশ নয়, বরং প্রতিটি পরিবারের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থাকেও দৃশ্যমান করেছে। সীমিত আয়, দারিদ্র, গবাদি পশুর ওপর নির্ভরতা, পরিত্যক্ত ঘর, হিন্দু-মুসলিম পারিবারিক পার্থক্য সবই সেট ও প্রপসের মাধ্যমে দর্শকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটি সাংস্কৃতিক বাস্তবতার প্রতিফলন সমাজতাত্ত্বিক চলচ্চিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং 'গোর; চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনায় বাস্তবতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টাই সবচেয়ে বড় সাফল্য। কিছু ক্ষেত্রে যেমন ঝড়ের পরে গাছের ডালপাতার অনুপস্থিতি, চরাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের ঘাটতি)

সামান্য দুর্বলতা থাকলেও, সামগ্রিকভাবে চলচ্চিত্রটি গ্রামীণ জীবনের অর্থনৈতিক অনটন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সামাজিক বাস্তবতাকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। তাত্ত্বিকভাবে বললে এটি মিজ-আঁ-সেন, বাস্তববাদী তত্ত্ব এবং সাংস্কৃতিক প্রতিফলনবাদ এর আলোকে সফল শিল্প নির্দেশনার উদাহরণ।

চ) নোনা জলের কাব্য চলচ্চিত্রের কাহিনী সংক্ষেপ:

জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব ও ধর্মীয় কুসংস্কার নিয়ে রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিতের লেখা চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় ২০২১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা নোনা জলের কাব্য। এই চলচ্চিত্রের কাহিনী সংক্ষেপ হলো নোনা জলের কাব্য ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর একটি মূল ভূখণ্ড হতে বিচ্ছিন্ন প্রান্তিক জেলে পল্লী জনগণের পরিবর্তিত পরিবেশে সংগ্রাম ও পাশাপাশি জেলেদের দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতিকে ধর্মশ্রয়ী মানুষের সদা প্রভাবের পটভূমিতে নির্মিত সিনেমা। গল্পে প্রধান নায়ক রুদ্র (তিতাস জিয়া) বাবার মৃত্যুর পর, নতুন কিছু ভাষ্য তৈরীর জন্য ঢাকার কোলাহল ছেড়ে, বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে একদিনের নৌকা ভ্রমণ দূরত্বে প্রত্যন্ত ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের একটি গ্রামে আসেন। গ্রামের চেয়ারম্যান (ফজলুর রহমান বাবু) ও গ্রামবাসি তাকে স্বাদরে গ্রহণ করে। রুদ্র এই গ্রামে বাশারের (অশোক ব্যাপারি) বাড়ি ভাড়া করে থাকা শুরু করেন। রুদ্র'র আধুনিক ভাবনা আর বানানো প্রায় জীবন্ত ভাষ্যগুলি গ্রামের তরুণদের আলোড়িত এবং বাশারের মেয়ে টুনি (তাসনুভা তামান্না) কে আকৃষ্ট করে। রুদ্র'র প্রতি টুনি'র ভালবাসাকে কেউ ভালভাবে গ্রহণ করে না, বরং ভ্রুকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে দেখে। জেলে প্রধান এই গ্রামের জনগণ প্রকৃতির প্রতি নির্ভরশীল, সাগরের উত্তাল আচরণে ভীত ও সদা শঙ্কিত। তাদের প্রধান রোজগার আসে বর্ষা মৌসুমে ধরা ইলিশ বিক্রি করে। সে মৌসুমে জেলেদের জালে খুব বেশি মাছ ধরা দিলনা। জালে বেশি মাছ পাওয়া জন্য বিশেষ নামাজ ও মিলাদের আয়োজন করা হয়। গ্রামের বয়োজৈষ্ঠরা মাছের আকালের কারণ হিসেবে রুদ্রের প্রতি দোষারোপ করেন। চেয়ারম্যান ও তার অনুগতরা গ্রামের সবাইকে রুদ্রের সাথে মিশতে মানা করে। রুদ্র প্রতিমূর্তি বানানোয় সাগর আরো উত্তাল হচ্ছে; সৃষ্টিকর্তা তাদের প্রতি সুনজর ফিরিয়ে নিয়েছেন। রুদ্র জেলেদের বোঝানোর চেষ্টা করে জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে এ মৌসুমে বেশি মাছ ধরা পরছে না। পরের মৌসুমে পর্যাপ্ত মাছ ধরা পরলে জেলেরা রুদ্রের প্রতি সহানুভূতি দেখায়। রুদ্র জেলেদের সাথে আবার মিশে যায়, তাদের মৎস্যশিকার দেখতে নৌকার করে সমুদ্রে যায়। িদিন কয়েক পর দিগন্তের কাছে ঘূর্ণিঝড় দানা বাধে। বেতারে ৭ নম্বর বিপদসংকেতের সতর্কবার্তা আসে। চেয়ারম্যান দরিদ্র জেলেদের এই বিপদসংকুল সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য বলে। চেয়ারম্যানের চাপে জর্জরিত জেলেদের ধর্মের দোহাই দিয়ে বলা হয়, তাদের পূর্বপুরুষরা বেতার বার্তা শুনতেন না, তবুই তারা মাছ ধরতেন। রুদ্র জেলেদের উত্তাল সমুদ্রের মাঝে মাছ ধরতে বাঁধা দেয়। নিজেদের জীবন বিপন্ন না করে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। ঘূর্ণিঝড় থেকে বাঁচতে গ্রামের সবাই আশ্রয় কেন্দ্রে জড়ো হয়।

নোনা জলের কাব্য চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনা:

জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব ও ধর্মীয় কুসংস্কার নিয়ে এই সিনেমায় শিল্প নির্দেশনা দিয়েছেন শিহাব নুরুন নবী। এই সিনেমার জন্য শিল্প নির্দেশনা দল সিনেমা শুটটিং এর এক মাস পূর্বে শ্যুটিং স্থল অর্থ্যাৎ কুয়াকাটার চরে অবস্থান করেন। চরের মানুষের জীবনযাত্রা এই সিনেমায় উঠে আসে। এই সিনেমা নির্মাণের জন্য সবগুলো থাকার ঘর

অর্থ্যাৎ নায়ক-নায়িকা, চেয়ারম্যান, মসজিদ, চায়ের স্টল ইত্যাদি পুরোপুরি নির্মাণ করতে হয়। কারণ চরে বাসকারী জেলেদের ঘরগুলো দীর্ঘদিনের জন্য ছেড়ে দেওয়া বা যেসব ঘর আছে তা পাত্রপাত্রী-ক্যামেরার মুভমেন্ট এর জন্য সুবিধাজনক না হওয়ায় নতুন করে সবকিছু নির্মাণ করতে হয়েছে। এই সিনেমান প্রোডাকশন ডিজাইনার ছিলেন ফ্রান্সের একজন শিল্পী সিলভা। যিনি বাংলাদেশের তারেক মাসুদ পরিচালিত *মাটির ময়না* চলচ্চিত্রের প্রোডাকশন ডিজাইন করেছেন। এই সিনেমার শিল্প নির্দেশনার কাজ বাস্তবধর্মী হওয়ায় যথেষ্ট সচেতনতার সাথে করতে করতে হয়েছে। কারণ ঘরগুলো এমনভাবে নির্মাণ করতে হয়েছে যেন সূর্য কোন দিকে দিয়ে কিরণ দেয় যা লাইটিং এর জন্য সুবিধা, মসজিদের নির্মাণে কেবলা কোন দিকে। সিনেমার প্রধান ক্যারেক্টারের ধর্ম সনাতন হওয়ায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। সিনেমায় ব্যবহৃত নৌকার ডিজাইন করা, নৌকায় সিনেমার প্রয়োজনে পতাকা বা অন্যান্য জিনিসপত্র যুক্ত করা। নদীর ঘাট তৈরি করা, নায়ক সুমিতের ঘর তৈরি করা। ঠিক যেন জেলেদের মতই।

চলচ্চিত্রের নির্দেশনার আধেয় উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ:

রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিতের নোনা জলের কাব্য চলচ্চিত্রটি কেবল একটি গল্প নয়, বরং জলবায়ু পরিবর্তন, ধর্মীয় কুসংস্কার, এবং প্রান্তিক জেলেদের সংগ্রামী জীবনচিত্রের এক বাস্তবধর্মী উপস্থাপন। এই সিনেমার শিল্প নির্দেশনা কাজ করতে গুটিং গুরুর প্রায় এক মাস আগে শিল্প নির্দেশনা দল কুয়াকাটার চর অঞ্চলে অবস্থান করে স্থানীয় জীবনযাত্রা, পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট পর্যবেক্ষণ করেন। পুরো চলচ্চিত্রে বাস্তবতা বজায় রাখার জন্য চরায়ালের প্রকৃত জীবনযাত্রা অনুসারে প্রতিটি সেট তৈরি করা হয়। শিল্প নির্দেশনার দৃষ্টিকোণ থেকে আধেয় বিশ্লেষণ করে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও শিল্প নির্দেশনার ধারা পাওয়া যায়।

সেট ডিজাইন ও নির্মাণ: নায়ক-নায়িকা, চেয়ারম্যান, সাধারণ জেলে পরিবারের জন্য আবাস ঘরগুলো নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়। কারণ চরের প্রকৃত ঘরগুলো দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের উপযোগী ছিল না এবং ক্যামেরার মুভমেন্টের জন্যও অনুপযুক্ত। তাই ঘরগুলো জেলেপল্লীর স্বাভাবিক রূপ বজায় রেখে পুনর্নির্মাণ করা হয়। ধর্মীয় বাস্তবতাকে মাথায় রেখে অর্থ্যাৎ কেবলার দিক নির্ধারণ করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এটি শুধু ধর্মীয় পরিবেশকেই প্রকাশ করে না, বরং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্বেষী সমাজের প্রভাবও চিত্রায়িত করে। গ্রামীণ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ চায়ের দোকান ও ছোটখাটো বাজারের পরিবেশ তৈরি করা হয়, যা সিনেমায় সামাজিক সম্পর্ক ও চরবাসীর দৈনন্দিন জীবনের অংশকে ফুটিয়ে তোলে।

মৎস্যজীবীদের জীবনধারাকে বাস্তবভাবে উপস্থাপন করতে নৌকাগুলো বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়। নৌকায় প্রয়োজনীয় পতাকা ও অন্যান্য সামগ্রী যুক্ত করে জেলেদের জীবন ও সংস্কৃতির ছাপ দেওয়া হয়। ঘাটও এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যেন তা স্থানীয় চরবাসীর বাস্তব জীবন প্রতিফলিত করে।

নান্দনিক সচেতনতা: সূর্যের আলো কোন দিক থেকে আসবে তা বিবেচনা করে ঘরগুলোর অবস্থান নির্ধারণ করা হয়, যাতে প্রাকৃতিক আলোর ব্যবহার সিনেমাটোগ্রাফির জন্য সুবিধাজনক হয়। প্রধান চরিত্র রদ্র যেহেতু ভিন্ন ধর্মীয়

পটভূমি থেকে এসেছে, তাই তার ঘরের নির্মাণে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়, যাতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য ফুটে ওঠে।

শিল্প নির্দেশনার গুরুত্ব: এই চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার কাজ শুধু দৃশ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নয়, বরং গল্পের আবহ, চরিত্রের বিশ্বাস এবং পরিবেশগত বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে একটি মৌলিক ভূমিকা রাখে। ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী প্রান্তিক মানুষের দুর্দশা, ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রভাব এবং প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করা মানুষের জীবনযাত্রা সেট ডিজাইন ও প্রপসের মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্রের স্ক্রিনশট বিশ্লেষণ:

সেট ডিজাইন ও প্রপস এবং রঙ:



কহর থেকে চর অঞ্চলে নির্জজ্ঞাভাবে কাজ করার জন্য নায়ক রুদ্র নৌকা যুগে ছুটে চলছে। সেই নৌকা প্রকৃত অর্থে ব্যবহারের জন্য প্রকৃত নৌকার সাথে বিভিন্ ধর্মীয় অনুসঙ্গ যেমন পতাকা, কুরআনের বাণী লেখা যা ঝড়বদলে সময় পাঠ করতে হয়।



পতাকাগুলোর ডিজাইন সমুদ্রে চলাচলের সতর্ক সংকেত ও দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে বাংলাদেশের পতাকা ব্যবহার করা হয়েছে । যা বাস্তব সম্মত ।



নৌকা থেকে মাল খালাস ও ভর্তির যাতায়েতের জন্য ঘাট নির্মাণ প্রকৃত অর্থেই পতাকায়ের সংস্কৃতি নির্দেশ করেছে ।



গল্পে সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেশ কিছু প্রপস এর ব্যবহার প্রনিধানযোগ্য। ভাস্কর্য বহনের কাঠের বক্স, বাশের, কাঠ (শুকনো গাছ) প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। আলোকসম্পাদন বলতে নৌকায় আরবি হরফ সাদা রঙে লেখা হয়েছে যা পবিত্রতা নির্দেশ করে এবং বাস্তবিক অর্থেই অর্থবহ হয়েছে।



নায়ক রুদ্দের ঘর সূর্যের আলো পাওয়ার জন্য পূর্বমুখ করে ঘর নির্মাণ এবং চরের তুলনামূলক একটু উচু জায়গায় লোকেশন হিসেবে ঘরের স্থান দেওয়া হয়েছে যাতে বৃষ্টি হলে পানি না উঠে।



ঘরের জানালা দক্ষিণ-পূর্ব মুখি করে রাখা হয়েছে এবং তুলনামূলক বড় করে কাটা হয়েছে যাতে পর্যাপ্ত আলো প্রবেশ করতে পারে এবং ঘর থেকে সাগরের সৌন্দর্য অবলোকন করা যায় এবং তার দৃশ্য স্কেচে ধরা যায়। ঘর নির্মাণের যে উপাদান তা বাস্তবিক জেলে পাড়ার ঘরের মতোই উপাদান মিশ্রণ। বাশ, ছন, বেত, পলিথিন প্রভৃতি স্থল মূল্যের উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে ঝড়ে ঘর-বাড়ি বিপর্যস্ত হলে যেন পুনরায় স্বল্প ব্যয়ে নির্মাণ করা যায়।



একজন ভাস্কর্যের যে ধরনের ঘরের ইন্টেরিয়র থাকে তার সাথে রুদ্রে ঘর যতার্থই হয়েছে বলে বিশ্বাসযোগ্য। কারণ ঘরের ভিতরে ভাস্কর্য নির্মাণের বিভিন্ন উপকরণ, স্কেচবুক, স্ট্যান্ড, বিভিন্ন মানুষ কঙ্কাল, ড্রয়িং সহযোগী তুলি, রঙ, ইত্যাদি।



সাগরপাড়ে বিদ্যুত পৌছাতে পারেনি। তাই জেলে পাড়ায় ব্যবহৃত হয় এত ধরনের কুপি বাতির ব্যবহার হচ্ছে। এবং তরল রাসায়নিক ছোটানোর জন্য স্বল্প ব্যয়ে ক্রয় এবং ব্যবহাযোগ্য প্লাস্টিকের বোতল-মিক্সড স্প্রে মেশিন। ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য চিকন তার যা বাস্তবিক অর্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে। ঘরের ভিতরের দেয়ালে এবং আশবাবপত্রে কালচে রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। ঘর নির্মাণের যে উপাদান তার রঙও কালচে যা জেলে পাড়ার স্বাভাবিকতা প্রকাশ পেয়েছে। এবং জলবায়ুর অভিঘাতে তাদের জীবন যে একটু বিবর্ণ তা প্রকাশ পেয়েছে।



বাশারের ঘর ভাড়া করেই শুধু রুদ্র থাকে না বরং তাদের তৈরিকৃত খাবারও সে ভোক্ষন করে। জেলে বাশারের ঘরও ও তাদের ব্যবহৃত জেলে পাড়ার মতোই। সাধারণ এলুমিনিয়ামের হাড়ি-পাতিল, হারিকেন, কুপি বাতি, বাশের খুটি, মাটিতে বসে খাবার খাওয়া ইত্যাদি জেলেদের দারিদ্রতার প্রতীক হিসেবে ব্যকহৃত হয়েছে। যা বাস্তবিকভাবেই বিশ্বাসযোগ্য।



ধর্মীয় আরাধনা প্রকাশের জন্য মুসলমানদের জন্য মসজিদ কেবলা মুখি বা পশ্চিক দিকে ফিরিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। এবং নামাজের জন্য এসো এসব বার্তা পৌছানোর জন্য উচু শুকনো বাশের মাথায় মাইক ব্যবহার করা হয়েছে। মসজিদও ছন, বাশ ইত্যাদি ব্যবহার করে নির্মাণ কা হয়েছে।



যা জেলে পাড়ার ভারসাম্য বিনির্মাণের প্রতীক। রঙও কাছাকাছি রাখা হয়েছে। তবে মসজিদের চালের খড়গুলো তুলনামূলক নতুন। যা নির্মাণের সময়কে নির্দেশ করে এবং মসজিদের প্রতি এক ধরনের গুরুত্বরূপের বিষয়ও উঠে আসে।

অন্যদিকে গ্রামের তুলনামূলক বেশি আরবি শিক্ষিত ভদ্রলোক চেয়ারম্যান তার ঘর এবং স্ত্রী হারানো বিমর্ষ চেহারা প্রতিকৃতি। চেয়ারম্যান তার স্ত্রীর ব্যবহৃত কাপড় স্বয়ং আলমাড়িতে রেখে দিয়েছে যা দেখতে ব্যবহৃত পুরনো কাপড় ই মনে হচ্ছে। যা বাস্তবতার প্রতীক। আবার চেয়ারম্যান যেহেতু একটু মর্যাদাবান সেহেতু সে সৌর বিদ্যুত ব্যবহারের ব্যয়ভার বহনের সক্ষমতা রাখে।



আবার চেয়ারম্যান যে একটু মাতাব্বর জেলে পাড়ার সবাই শ্রদ্ধা করে তার জন্য তাকে একুট সামাজিকভাবে মর্যাদাশালী করে দেখানো হয়েছে। তার ব্যবহৃত কাঠের চেয়ার-টেবিল, পান রাখার সৌখিনতা ও ঐতিহ্যতার প্রতীক পিতলের পাত্র, পাশে রাখা রেজিস্টার খাতা যেখানে জেলেদের সম্পর্কে বিভিন্ন হিসাব রাখা হয়। আবার খাতা দেখতে নতুন মনে হচ্ছে। হয়তো পুরাতন খাতা শেষ হিসাবের জন্য নতুন নেওয়া হয়েছে। যা যতার্থই বাস্তবসম্মত।



আবার সেই বাশ, কাগজ দিয়ে নির্মিত গ্রামের চায়ের দোকান বা টঙ দোকান যেখানে চা এর সাথে টা এর ব্যবস্থাও আছে।



গ্রামের মাতাব্বর হিসেবে মর্যাদার প্রতীকী স্বরূপ আলিশান কাঠের চেয়ার যা জমিদার বা গ্রামের মত মোড়লরা ব্যবহার করে থাকে। তার প্রকৃতি ব্যবহার হয়েছে।



ঘূর্ণিঝড় আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যেরকম প্রকৃতি থাকে তা তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে কালার টোন কালচে-ধূসর বর্ণের।



এবং বাড় বয়ে যাওয়ার সাগর পাড়ের লন্ডবন্ড পরিবেশ এবং তার কিছুদিন পর সেই শিকড় অর্ধ উপড়ে পড়া গাছে সবুজ পাতা গজিয়েছে যা প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে।

সর্বোপরি *নোনা জলের কাব্য* চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনার ধারা বা ধরন এবং বৈশিষ্ট্য বাস্তবধর্মী। পুরো চলচ্চিত্র জুরে শিল্প নির্দেশনার চমৎকার প্রয়োগ দেখা গিয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন মসজিদের চাল, রেজিস্টার থাতা পুরোপরি নতুন মনে হয়েছে আর রঙের ক্ষেত্রে আরও একটু সতর্ক হওয়া যেত। এছাড়া মোটের উপর শিল্প নির্দেশনা বাস্তবসম্মত।

নোনা জলের কাব্য সিনেমার শিল্প নির্দেশনা তাত্ত্বিকগত বিশ্লেষণ:

বাস্তববাদী শিল্প নির্দেশনা: এই চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বাস্তববাদ। চরাঞ্চলের প্রকৃত পরিবেশ, জেলে পাড়ার ঘরবাড়ি, নৌকা, ঘাট, চায়ের দোকান সবকিছু এমনভাবে নির্মিত ও ডিজাইন করা হয়েছে যাতে দর্শক মনে করেন তিনি আসলেই একটি জেলে গ্রামে অবস্থান করছেন। নৌকায় পতাকা, আরবি হরফে বাণী ও স্থানীয় প্রতীক যুক্ত করা বাস্তবতার সাথে সাংস্কৃতিক রেফারেন্সকেও মিলিয়ে দিয়েছে। ঘর তৈরিতে বাঁশ, ছন, বেত, পলিথিনের মতো স্থানীয় উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে, যা চরবাসীর অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে।

প্রতীকধর্মী শিল্প নির্দেশনা: শিল্প নির্দেশনার ভেতরে শুধু বাহ্যিক বাস্তবতা নয়, বরং প্রতীকী অর্থও নিহিত রয়েছে। মসজিদের কেবলামুখী নির্মাণ, ক্ষেত্র বিশেষে ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রতীক, আবার নতুন খড়ের চাল সমাজে ধর্মীয়

প্রতিষ্ঠানের বিশেষ গুরুত্ব ও সম্মানকে নির্দেশ করে। চেয়ারম্যানের কাঠের আসবাবপত্র, পিতলের পানপাত্র ও রেজিস্টার বই এগুলো তার সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতার প্রতীক। বাড় পরবর্তী এলোমেলাভাবে পড়ে থাকা গাছপালা এবং পরে গজিয়ে ওঠা নতুন পাতা প্রকৃতির ধ্বংস ও পুনর্জন্মের চক্রের প্রতীক।

পরিবেশগত বাস্তবতা: শিল্প নির্দেশনা কেবল মানবজীবন নয়, বরং প্রকৃতির প্রভাবও তুলে ধরেছে। ঘর পূর্বমুখ করে নির্মাণ, জানালা বড় করে রাখা এসব সিদ্ধান্ত সিনেমাটোগ্রাফি ও প্রাকৃতিক আলো ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আবার বাস্তব জীবনের যুক্তিও বহন করে। বৃষ্টির সময় পানিবদ্ধতা এড়ানোর জন্য উঁচু জায়গায় ঘর বসানো হয়েছে, যা চরবাসীর জীবনযাপনের কৌশলকে প্রকাশ করে। কালচে-ধূসর কালার টোন ঝড়ের পূর্বমুহূর্তেও ভয়ঙ্কর পরিবেশকে চাক্ষুষ করে তোলে।

চরিত্র-নির্ভর শিল্প নির্দেশনা: প্রতিটি চরিত্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় শিল্প নির্দেশনার মাধ্যমে আলাদা করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নায়ক রুদ্রের ভাস্কর্য নির্মাণের সরঞ্জাম, স্কেচবুক, কঙ্কাল, তুলি প্রভৃতি তার সৃজনশীল কিন্তু ভিন্নধর্মী পটভূমিকে নির্দেশ করে। সাধারণ অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি-পাতিল, হারিকেন, কুপি বাতি দারিদ্রের ও সময়ের প্রতীক। সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক সামর্থ্যের কারণে কাঠের চেয়ার, পিতলের পাত্র, সৌর বিদ্যুত ব্যবহার এগুলো চেয়ারম্যানের সামাজিক অবস্থানকে ভিজ্যুয়ালি আলাদা করে।

নান্দনিক সচেতনতা: সিনেমাটোগ্রাফির সুবিধার্থে প্রাকৃতিক আলো ও লোকেশনের ব্যবহার শিল্প নির্দেশনার নান্দনিক সচেতনতা প্রমাণ করে। সূর্যেও আলো কোথা থেকে আসবে, কখন কীভাবে কিরণ দিবে, ঘরের জানালা কোন দিকে হবে এসব পরিকল্পনা চলচ্চিত্রের ভিজ্যুয়াল সৌন্দর্য ও দৃশ্যমান বাস্তবতাকে একীভূত করেছে। ঘরের দেয়াল ও আসবাবের কালচে রঙ চরবাসীর জীবনযাত্রার বিবর্ণ বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করেছে। তবে শিল্প নির্দেশনার কিছু উপাদান (যেমন মসজিদের নতুন খড়ের চাল, একেবারে নতুন রেজিস্টার বই) তুলনামূলক কম বাস্তবসম্মত মনে হয়েছে। আবার টেক্সা-টোন আরও সতর্কভাবে প্রয়োগ করলে পরিবেশ আরও জীবন্ত হয়ে উঠত।

৪.২. সাক্ষাৎকার তথ্য উপস্থাপন:

আপনার শিল্প নির্দেশনায় যাত্রা কবে শুরু করেন প্রশ্নে প্রথম প্রজন্মের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প নির্দেশক আব্দুস সবুর বলেন ১৯৬১ সালে কখনো আসেনি ছবিতে সহকারী হিসেবে কাজ করি। পরে সুতরাং (১৯৬৪) থেকে পূর্ণাঙ্গ শিল্প নির্দেশক হিসেবে কাজ শুরু করি। স্বাধীনতার আগে ও পরে শিল্প নির্দেশনায় পার্থক্য কী ছিল প্রশ্নে তিনি জানান স্বাধীনতার আগে মূলত প্রেম, সামাজিক গল্পে কাজ হতো। তখন সেটও সহজ ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি আসল, যেমন ওরা ১১ জন (১৯৭২)। সেসবে যুদ্ধক্ষেত্র, গ্রাম ধ্বংস ইত্যাদি তৈরি করতে হয়েছিল বাস্তবভাবে। শিল্প নির্দেশনার আপনার বৈশিষ্ট্য কী প্রশ্নে বলেন বাস্তবতার প্রতি অনুরাগ। চরিত্রের পোশাক, ঘরবাড়ি, ব্যবহারিক জিনিস সবই যেন তাদের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মানানসই হয়, সে দিকে সবসময় খেয়াল রাখতাম।

একজন শিল্প নির্দেশকের আসল কাজ কী প্রশ্নের উত্তরে সিজাজুল ইসলাম বলেন চিত্রনাট্যকে দৃশ্যমান করা। শুধু সাজসজ্জা নয়, সেট যেন চরিত্রের মতো প্রাণ পায়। দর্শক যাতে অনুভব করে সে দৃশ্যের ভেতরে ঢুকে গেছে। প্রশ্ন: আপনার কাজের বৈশিষ্ট্য প্রশ্নে বলেন রান্নাঘরের বাঁশে তেলের দাগ, ঘরে ফাটা দেয়াল, হাসপাতালের দরজা পর্যন্ত আমি বাস্তবে মতো করতাম। আর নতুন প্রযুক্তি ব্যাকগ্রাউন্ড প্রজেকশন, রিফ্লেক্টিভ লাইট এসবও ব্যবহার করেছি।

চলচ্চিত্রে প্রবেশের পথ কেমন ছিল প্রশ্নের উত্তরে আধুনিক ধারার শিল্প নির্দেশক উত্তম গুহ বলেন আমি থিয়েটার থেকে এসেছি। মঞ্চে লাইটিং, সেট, কস্টিউমে কাজ করতাম। পরে চলচ্চিত্রে সুযোগ পাই। কোন কাজকে নিজের মাইলফলক মনে করেন এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, অন্য জীবন (১৯৯৪)। এখানে পূর্ণাঙ্গভাবে শিল্প নির্দেশক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাই। এরপর থেকেই চলচ্চিত্রে আমার কাজকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আপনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী প্রশ্নের ব্যাপাও বলেন প্রতিটি স্কেমকে আমি একটা ছবি বা পেইন্টিং হিসেবে দেখি। কম্পোজিশন, রঙের ব্যবহার, আলোকসজ্জাভূমি মিলিয়ে সিনেমাটোগ্রাফির সঙ্গে মিলিয়ে একটা ভিজুয়াল স্টাইল তৈরি করি।

আপনি কীভাবে চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনায় এলেন এমন প্রশ্নে সমসাময়িক জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্প নির্দেশক শিহাব নূরুন নবী বলেন আমি চারুকলায় পড়েছি। প্রথমে ইন্টেরিয়র ডিজাইন, পরে বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করি। একসময় সুযোগ আসে চলচ্চিত্রে কাজ করার। আপনার উল্লেখযোগ্য কাজ কোনগুলো এতে তিনি জানান নোনা জলের কাব্য যা আমাকে জাতীয় পুরস্কার এনে দেয়, এছাড়া শনিবার বিকাল, রিকশা গার্ল, মহানগর। এগুলোতে বাস্তব ও নান্দনিকতার সমন্বয় করার চেষ্টা করেছি। আপনার শিল্প নির্দেশনায় কী বৈশিষ্ট্য তার উত্তরে তিনি বলেন আমি চেষ্টা করি দর্শক যেন লোকেশন ও চরিত্রের আবহকে নিজের চোখে দেখে বলে মনে করে। যেমন সমুদ্রসৈকতের ঝড়ো পরিবেশ বা ঢাকার জনাকীর্ণ রাস্তার সবকিছু যতটা সম্ভব বাস্তব করে তুলি। শিল্প নির্দেশনায় চ্যালেঞ্জে কেমন প্রশ্নের উত্তরে বলেন বাজেট সীমিত, সময় কম। আবার আমাদের দেশে পেশাদার প্রশিক্ষণের সুযোগও কম। তবে সৃজনশীলতা দিয়ে আমরা ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করি।

৫. ফলাফল উপস্থাপন ও পর্যবেক্ষণ:

৫.১. বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার যবনিকা:

ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের হাত ধরে ১৮৯৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিশ্ব চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হলে পূর্ববঙ্গে তথায় ঢাকায় ১৮৯৮ সালেই প্রথম সিনেমা প্রদর্শিত হয়। অন্যদিকে উপমহাদেশের প্রথম বাঙালি হীরালাল সেন হাত ধরে বাংলায় চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হয়। হীরালাল সেনের হাত ধরে কলকাতায় সিনেমা শুরু হলে পূর্ববঙ্গ হয়ে ওঠে সিনেমা প্রদর্শনের হাতিয়ার। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্রে নির্মাণ বিষয়ে ড. সাদেকের আহবানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় একজন অবাঙালি চিত্রপ্রদর্শক (গুলিস্তান সিনেমা হলের মালিক) খান বাহাদুর ফজল আহমেদ ‘পূর্ব পাকিস্তানের আর্দ্র আবহাওয়ায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব নয়।’ এই বক্তব্যের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রকৌশলী আব্দুল জব্বার খান বলে ওঠেন, এখানে ভারতীয় সিনেমার শ্যুটিং হয় তাহলে কেন পূর্ণাঙ্গভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব নয়। সেই চ্যালেঞ্জ স্বরূপ তিনি ১৯৫৬ সালে

পূর্ববঙ্গে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র মুখ মুখোশ নির্মাণ কওে তার সমুচিত জবাব দেন। কৃত্রিমতাবর্জিত ঢাকার আশে পাশের গ্রামকেন্দ্রিক দৃশ্যধারণ করা এই চলচ্চিত্রে সব কিছুকে ছাঁপিয়ে যেন পূর্ববাংলার সত্যিকারের প্রাণবন্ত প্রতিচ্ছবি। বাংলা ভাষায় নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র আউটডোর কেন্দ্রিক অত্যাৎ তখনো স্টুডিও কেন্দ্রিক সিনেমার কথা মাথায় আসেনি। আউটডোরের দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে বলে এই সিনেমায় শিল্প নির্দেশনা বিষয়টি পাশকাটিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৭ সালে চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা হলে চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। কারণ শিল্প নির্দেশনা চলচ্চিত্রের গল্প বলার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভালো শিল্প নির্দেশনা বা সেট ডিজাইন কেবল সাজসজ্জা নয় বরং এটি চলচ্চিত্রের ভাষা। যে ভাষা চলচ্চিত্রকে স্বাভাবিকতা দিয়েছে। কারণ এই সেটের প্রত্যেকটি ডিটেইলস একটি চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে। চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। সুতরাং চলচ্চিত্রে বিভিন্ন শাখার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এই শাখায় ভূমিকা রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বিধায় চলচ্চিত্র বিকাশের সাথে এই শাখারও উন্নতি সাধিত হয়। বিভিন্ন গুণী শিল্পগণ তাদের শৈল্পিক মন দিয়ে চলচ্চিত্রের ভাষাকে করেছে পরিশীলিত।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার একটি বিবর্তনের ইতিহাস রয়েছে। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীগণ তাদের যাদুর হাতের ছোঁয়া দিয়ে সেই বিবর্তনের ইতিহাসকে করেছে দৃঢ়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বলতে দিশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কে নির্দেশ করলেও বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস মূলত ১৯৫৬ সাল থেকেই শুরু। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার ইতিহাসের বিবর্তন ১৯৫৬ সাল থেকেই শুরু। এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর তার প্রযোজিত ১৯৫৯ মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র চলচ্চিত্র শিল্পে ক্যাপ্টেন হিসেবে খ্যাত এহতেশাম এর এ দেশ তোমার আমার তে এবং মহিউদ্দীন আহমেদের মাটির পাহাড় চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন চিত্রশিল্পী হাসান আলী। ১৯৫৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত অন্য দুটো ফতেহ লোহানীর আকাশ আর মাটি এবং এ জে কারদারের জাগো হুয়া সাভেরা চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে ১৯৬০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ফতেহ লোহানীর সিনেমা আসিয়া এর শিল্প নির্দেশক হিসেবে কাজ করেন এম হাসান অরুফে হাসান আলী। তার পরের বছর (১৯৬১) জহির রায়হান পরিচালিত কখনো আসেনি চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন হাসান আলী ও আব্দুস সবুর। চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনায় আব্দুস সবুরের আবির্ভাবের মাধ্যমে নতুন একজন শিল্পী যাত্রা করেন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত পথের পাঁচালি (১৯৫৭) চলচ্চিত্র থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়ে উঠেন। পথের পাঁচালি যেহেতু আউটডোর নির্ভর বাস্তবধর্মী সিনেমা সেহেতু ১৯৫৭ সালের ঠিক পরবর্তী সিনেমাগুলোর বেশিরভাগ ই আউটডোর নির্ভর। মাটির পাহাড়, আছিয়া, জাগো হুয়া সাভেরা প্রভৃতি সিনেমায় আউটডোর লোকেশন বেশি ছিল। কিন্তু জহির রায়হানের কখনো আসেনি সিনেমায় ইনডোর লোকেশন বেশি পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং চলচ্চিত্রে ইনডোর এবং আউটডোর লোকেশনে সেট নির্মাণ করতে হয়। দুই পরিবেশেই কাজে পারদর্শী হতে হয় শিল্পীদের। ১৯৬২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত আব্দুল জব্বার খানের জোয়ার এলো সিনেমাতেও হাসান আলী এবং সালাউদ্দীন এর সূর্যস্নান চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার মূল দায়িত্বে হাসান আলী এবং সহকারী হিসেবে আরো দুজনের নাম পাওয়া যায় যারা হলেন, বিজস সেন এবং বদরুদ্দিন। ১৯৬৩ সালে সালাউদ্দিন নির্মিত ধারাপাত সিনেমাতেও শিল্প নির্দেশনার কাজ করেন হাসান আলী। সুভাষ দত্তের পরিচালনায় সুতরাং (১৯৬৪) চলচ্চিত্রে সুভাষ দত্ত এবং এ সবুর তথা আব্দুস সবুর শিল্প নির্দেশনা দেন। ১৯৬৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাস্তবধর্মী সিনোম নদী ও নারী তে শিল্প নির্দেশনার দায়িত্বপালন করেন

চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীর। এ সিনেমা বেশিরভাগ আউটডোর লোকেশন ছিল। ১৯৬৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত পুনম কি রাত সিনেমাতে চিত্রশিল্পী মহিউদ্দেন ফারুক শিল্প নির্দেশনা দেন। ১৯৬৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জহির রায়হান পরিচালিত আনোয়ারা এবং খান আতাউর রহমান পরিচালিত নবাব সিরাজ উদ্দৌলা এবং নারায়নঘোষ মিতা পরিচালিত ও ১৯৬৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র এতটুকু আশা তেও শিল্প নির্দেশনার কাজ করেন আবদুস সবুর। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে এফডিসির স্থায়ী শিল্প নির্দেশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন হাসান আলী, আব্দুস সবুর এবং সিরাজুল ইসলাম। সময়ের ধারাবাহিকতায় এই যাত্রায় নতুন মুখ যুক্ত হয় কিন্তু উল্লেখযোগ্য নয়। এফডিসির তত্ত্বাবধানের বাইরে স্বাধীনভাবে শিল্প নির্দেশনার কাজে যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মহিউদ্দীন ফারুক এবং আতাউল্লাহ শাহ হাশমী, বিজয় সেন, মুর্তজা বশীর প্রভৃতি।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে উঠে সিনেমা নির্মাণের অন্যতম অনুসঙ্গ। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সিনেমাকে ইতিহাস ভিত্তিক সিনেমা বলে। এই ধরনের সিনেমার সেট নির্মাণে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ এখানে বাস্তবতার বিষয় আছে। আবার মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সিনেমা নির্মাণের পাশাপাশি অন্যান্য অনুসঙ্গ নিয়েও ছবি নির্মিত হতে থাকে। বাণিজ্যিক, সামাজিক, রোমান্টিক, অ্যাকশন, ইত্যাদি। এসব সিনেমাতেও শিল্প নির্দেশনার কাজ অনেক। ১৯৭২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত ওরা ১১ জন এবং কাজী জহির পরিচালিত অবুঝ মন ও জহিরুল হক পরিচালিত রংবাজ (১৯৭৩) চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনা দেন আবদুস সবুর। ১৯৭৩ মুক্তিপ্রাপ্ত আলমগীর কবীরের ধীরে বহে মেঘনা সিনেমাতে শিল্প নির্দেশনা দেন হাসান আলী। সুতরাং এইসব সিনেমায় শিল্প নির্দেশনার কাজ পুরনো শিল্পীর পাশাপাশি নতুন শিল্পীর আগমন ঘটে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আব্দুর রশিদ মমতাজ আলীর সোহরাব রুস্তম সিনেমা শিল্প নির্দেশনা দেন এবং সেই সাথে ১৯৯৪ সালে অন্য জীবন সিনেমাতে শিল্প নির্দেশনার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে কাজ শুরু করেন উত্তম গুহ। তারই ধারাবাহিকতায় তরুন ঘোষ, মো: কলমতর, অনিমেস আইস, মারুফ সামুরাই, শিহাব নুরুন নবী ও হিমা দ্রি বড়ুয়া চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার কাজ করে যাচ্ছেন।

৫.২. অগ্রগামী শিল্প নির্দেশক ও অগ্রণী ভূমিকা

হাসান আলী: বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের শিল্প নির্দেশনার ইতিহাসে হাসান আলী নিঃসন্দেহে একজন পথপ্রদর্শক ব্যক্তিত্ব। তাঁকে প্রথম প্রজন্মের শিল্প নির্দেশক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হয়, কারণ তিনি এমন এক সময়ে কাজ শুরু করেন যখন বাংলা চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার ধারণাটি একেবারেই নবীন ছিল। শুধু পরিচালকের কল্পনা নয়, দৃশ্যের ভিজ্যুয়াল নির্মাণে শিল্প নির্দেশক হিসেবে তিনি একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা প্রপাতিষ্ঠা করেন।

প্রাথমিক অবদান: হাসান আলী ১৯৫৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এ দেশ তোমার আমার চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন। এটি ছিল তাঁর প্রথম বড় কাজ, যেখানে তিনি চলচ্চিত্রের আবহ নির্মাণে বাস্তবধর্মী সেট ডিজাইন ব্যবহার করেন। একই বছরে মহিউদ্দীন আহমেদ পরিচালিত মাটির পাহাড় চলচ্চিত্রেও তিনি কাজ করেন, যা তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার প্রমাণ।

বহুমাত্রিক চলচ্চিত্রে কাজ: তিনি শুধু একটি চলচ্চিত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং ধারাবাহিকভাবে শিল্প নির্দেশক হিসেবে তাঁর অবদান রেখেছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চলচ্চিত্র হলো: আসিয়া (১৯৬০) যেখানে তিনি গ্রামীণ বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে কাঁচা বাড়ি, গৃহস্থালি সামগ্রী এবং আঞ্চলিক আবহ সৃষ্টিতে মনোযোগী ছিলেন। জোয়ার এলো (১৯৬২) নদীমাতৃক জীবনের আবহে নির্মিত এই ছবিতে তিনি নদী ও নৌকা কেন্দ্রিক পরিবেশকে চলচ্চিত্রের মূল প্রেক্ষাপটে মানানসই করে গড়ে তোলেন। ধারাপাত (১৯৬৩) এখানে শহুরে ও গ্রামীণ জীবনের মিলিত রূপায়ণে তিনি কৃতিত্ব দেখান।

বাস্তবধর্মী শৈলী ও সেট ডিজাইন: হাসান আলীর কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বাস্তবধর্মী গ্রামীণ লোকেশন ব্যবহার। তিনি ইনডোর ও আউটডোর উভয় প্রেক্ষাপটে সেট নির্মাণে দক্ষ ছিলেন। তাঁর নির্মিত সেটগুলো কেবল পটভূমি হিসেবেই থাকেনি, বরং চরিত্র ও কাহিনির আবহ গড়ে তুলতে কার্যকর ভিজুয়াল ভাষা তৈরি করেছিল। যেমন: গ্রামীণ জীবনের সরল কুটির, কাঁচা রাস্তাঘাট, নৌকা ও নদীপারের দৃশ্য, ঘরোয়া ব্যবহারের সামগ্রী ইত্যাদি। এসব উপাদান চলচ্চিত্রে প্রাণবন্ত আবহ সৃষ্টি করে, যা দর্শকের কাছে কাহিনিকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।

শিল্প নির্দেশনার ভিত্তি স্থাপন: বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে যখন শিল্প নির্দেশনার আলাদা কোনো কাঠামো তৈরি হয়নি, তখনই হাসান আলী তাঁর সৃজনশীলতা দিয়ে এই ক্ষেত্রটির ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, চলচ্চিত্রে লোকেশন, সেট, ব্যবহার সামগ্রী ও ভিজুয়াল পরিকল্পনা গল্প বলার একটি অপরিহার্য অংশ।

উত্তরাধিকারে প্রভাব: তাঁর কাজ পরবর্তীতে মহিউদ্দিন ফারুক, আব্দুস সবুর, সিরাজুল ইসলাম, মূর্তোজা বশির, সেলিম আহমেদ দীনু, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ শিল্প নির্দেশকদের অনুপ্রাণিত করে। ফলে, বাংলা চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা ধীরে ধীরে একটি সুসংগঠিত শাখা হিসেবে গড়ে ওঠে।

আব্দুস সবুর: শিল্প নির্দেশক আব্দুস সবুর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে একজন প্রভাবশালী এবং ব্যতিক্রমী শিল্প নির্দেশক হিসেবে পরিচিত। তাঁর শিল্প নির্দেশনার ক্ষেত্রে বাস্তবতা, ঐতিহ্য এবং প্রামাণ্যতার সমন্বয় ছিল।

গুরুত্বপূর্ণ সময় ও চলচ্চিত্রে যাত্রা: আব্দুস সবুর চলচ্চিত্র শিল্পে যাত্রা শুরু করেছিলেন ১৯৬৪ সালের ‘সুতরাং’ চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনায় মাধ্যমে। এরপর তিনি ধারাবাহিকভাবে ১৯৬৭ সালের ‘আনোয়ারা’, ‘নবাব সিরাজ উদ্দৌলা’ এবং ১৯৬৮ সালের ‘এতটুকু আশা’ চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এই সময় তার কাজের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল:

ঐতিহাসিক ও সমাজমুখী চিত্রায়ণ: সেট ডিজাইনে প্রামাণ্যতা বজায় রাখা, যেন দর্শক সময় এবং পরিবেশকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে। আসবাবপত্র ও পোশাকের বিশদ বিবরণে সূক্ষ্মতা, যা চরিত্র এবং সময়কালকে ফুটিয়ে তোলে।

স্বাধীনতার পর চলচ্চিত্র: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর, আব্দুস সবুর শিল্প নির্দেশনায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেন। তিনি ১৯৭২ সালের ‘ওরা ১১ জন’ এবং ‘অবুঝ মন’ এবং ১৯৭৩ সালের ‘রংবাজ’ চলচ্চিত্রের

মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টে কাজ করেন। এসময়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এবং ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রে বাস্তবসম্মত সেট নির্মাণ, যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং ঐতিহাসিক চরিত্রের জন্য যথাযথ পরিবেশ তৈরি করা এবং সেটে ব্যবহৃত সামগ্রী, দালান-ঘর, রাস্তা, পোশাক, অস্ত্র ইত্যাদির প্রামাণ্যতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

শিল্প নির্দেশনার মানোন্নয়ন: ঐ সময়ে যেসব চলচ্চিত্র মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাসের বাস্তবতা চিত্রিত করত, সেগুলিতে দর্শককে সেটের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার কাজ অন্যান্য শিল্প নির্দেশকদের জন্য মানদণ্ড স্থাপন করেছিল।

শৈলী ও বিশেষত্ব: বাস্তবতা ও প্রামাণ্যতায় অনন্য ভূমিকা পালন করেন আব্দুস সবর। তিনি সেট ডিজাইন সবসময় চরিত্রের জীবন ও সময়কালকে প্রতিফলিত করতেন। তিনি প্রায়শই ইতিহাস, সাহিত্য ও স্থানীয় সংস্কৃতির প্রামাণ্য উপাদান অন্তর্ভুক্ত করতেন। তাছাড়া ছোটখাটো উপকরণ থেকেও তিনি সেটকে জীবন্ত করে তুলতে পারতেন। সুতরাং সিনেমাতে সমাজমুখী প্রেক্ষাপট, সাধারণ মানুষের জীবনচিত্রের বাস্তব চিত্রায়ণ হয়। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবেশের ঘর, আসবাবপত্র, পোশাক ইত্যাদির মাধ্যমে চরিত্রের সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে। আনোয়ারা সিনেমায় গ্রামের প্রেক্ষাপট ও গ্রামীণ জীবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। গ্রামীণ ঘর, মাঠ, নদী এবং স্থানীয় সংস্কৃতির উপকরণ ব্যবহার করে বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি।

মহিউদ্দীন ফারুক: বহুমাত্রিক শিল্প নির্দেশক, দীর্ঘ ক্যারিয়ারে সর্বাধিক জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্প নির্দেশক হলেন মহিউদ্দীন ফারুক। তিনি শুধুমাত্র দেশের সেরা শিল্প নির্দেশকই নন, বরং দেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্প নির্দেশক হিসেবেও সুপরিচিত। তাঁর শিল্প নির্দেশনায় নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো যেমন ‘পালঙ্ক’, ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’, ‘পদ্মা নদীর মাঝি’, ‘মনের মানুষ’ প্রভৃতি বাংলা সিনেমার শীর্ষস্থানীয় সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত। শিল্প নির্দেশনায় তাঁর কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। পর্যাট্রমে আলোচনা করা হয়েছে।

বাস্তব পরিবেশের প্রতি অঙ্গীকার: ফারুক সবসময় সেটে বাস্তব পরিবেশ তৈরি করতে সচেষ্ট ছিলেন। যেমন: ডুমুরের ফুল সিনেমার একটি দৃশ্য কলতলায় শ্যাওলা ও কাদা তৈরি করে বাস্তবতার ছাপ দিয়েছেন। পদ্মা নদীর মাঝি চলচ্চিত্রে জেলের গ্রাম, ঘর, নৌকা ও মাছ বিক্রির দৃশ্য প্রায় সম্পূর্ণ গবেষণা ও বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি করেছেন। মনের মানুষ সিনেমায় লালনের জলমগ্ন হাওরের পরিবেশে তাঁর সেট তৈরি করা হয়েছে এমনভাবে যে জুরি বোর্ডও ভেবেছিল শুটিং আসল স্থানে হয়েছে।

সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং নৈপুণ্য: ফারুক তাঁর প্রকল্পে এমন ক্ষুদ্রতম বিশদেও নজর দিয়েছেন যা সাধারণত দর্শক বা পরিচালকের চোখে আসে না। যেমন, সূর্য দীঘল বাড়ী সিনেমায় রান্নাঘরের বাঁশের খুঁটিতে তেলের চিটচিটে ভাব তৈরি করা, ডুমুরের ফুল সিনেমায় হাসপাতালে দরজা-জানালায় মাপ অনুযায়ী সেট বানানো, পুরো সেটে সত্যিকারের পরিবেশের প্রতিফলন, এবং পালঙ্ক সিনেমাতে চরিত্রদের পোশাককে সময় এবং সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী তৈরি করা, পুরনো কাপড়কে নতুনভাবে প্রয়োগ করার ইত্যাদি।

প্রযুক্তি এবং প্রাচীন কৌশলের মিশ্রণ: প্রজেক্টর এবং ব্যাকথ্রাউন্ড পেইন্টিং ব্যবহার করে রাতের চাঁদের আলো তৈরি করা। মিন্টু আমার নাম, প্রতিজ্ঞা, লালু মাস্তান সিনেমার মিনিয়চার তৈরি, স্পেশাল ইফেক্ট দেওয়া, ডাইমেনশনের খেলায় নতুন উদ্ভাবকও তিনি। মতস্যকুমারীর মতো পানির নিচে দৃশ্যধারণ, রিফ্লেকটিভ লাইটের ব্যবহার বাংলার সিনেমায় প্রথম শুরু করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ: ঢাকা আর্ট কলেজের শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব শুটিংয়ের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে কাজ করেছেন। ব্যবহারিক শিক্ষা হিসেবে লো-কি ফটোগ্রাফি, আলো, ছায়ার এবং সেটের টোনাল ভেরিয়েশন শিখেছেন, যা সিনেমায় বাস্তব গভীরতা যোগ করেছে।

সহযোগিতা এবং পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা: ফারুক শুধু নিজের দিক থেকে সেট বানাননি, পরিচালক ও চিত্রগ্রাহকের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সেট ডিজাইন করেছেন। মিন্টু আমার নাম সিনেমায় ১৮-১৯টি জানালা ব্যবহার করে দৃশ্যের প্রভাব বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রভাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। পদ্মা নদীর মাঝি সিনেমায় জেলের জীবন, নৌকা ও মাছ বিক্রির দৈনন্দিনতা পরিচালকের অনুরোধমতো বাস্তবায়ন করেছেন।

শিল্প নির্দেশনার প্রভাব: তাঁর হাতে তৈরি সেটগুলি চলচ্চিত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সময়ের সাথে প্রাসঙ্গিকতার অনুভূতি দেয়। বহু ছবি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং বিএফজেএ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। সহকারী শিল্প নির্দেশক এবং শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলার সিনেমার শিল্প নির্দেশনার মান বাড়িয়েছেন। সুতরাং মহিউদ্দিন ফারুক শুধু দৃশ্যের পটভূমি তৈরি করেননি; তিনি সেটকে কথা বলার উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তার শিল্প নির্দেশনার মূল চাবিকাঠি হলো, বাস্তবতা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, প্রযুক্তি-সৃজনশীল ব্যবহার, পরিচালক ও গল্পের সঙ্গে সমন্বয়। বাংলা চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশনায় তার অবদান চিরস্মরণীয়, যা এখনো নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের জন্য উদাহরণ।

উত্তম গুহ: উত্তম গুহ মহিউদ্দীন ফারুকের মতো শিল্প নির্দেশনায় অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছেন। অন্য জীবন (১৯৯৪)-চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার মাধ্যমে তিনি নব্বই দশকে শিল্প নির্দেশনায় যুক্ত হন বটে কিন্তু এমন পর্যন্ত তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ০৭ বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছে। তিনি সমকালীন বাণিজ্যিক ও আধুনিক ধারার চলচ্চিত্রে ভিজুয়াল স্টাইল আনেন। তাঁর শিল্প নির্দেশনার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ।

থিয়েটার অভিজ্ঞতা ও শিল্প নির্দেশনায় আগ্রহ: উত্তম গুহের শিল্প নির্দেশনায় আগ্রহ তাঁর থিয়েটারে কাজ করার সময় থেকেই শুরু। তিনি মঞ্চে লাইটিং, কস্টিউম ও সেট ডিজাইনের কাজ করতেন, যা তাঁর শিল্প নির্দেশনার দক্ষতা গঠনে সহায়ক হয়েছিল। তিনি বলেন, “মঞ্চে টুকটাক অভিনয় করতাম। লাইটিং, কস্টিউম ও সেট তৈরি করাই আমার মূল কাজ ছিল। অভিনয়ের ব্যাপারে কখনোই তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না; যদিও অনেক ছবিতে অভিনয় করতে হয়েছে।

চলচ্চিত্রে পূর্ণাঙ্গ শিল্প নির্দেশক হিসেবে অভিষেক: ১৯৯৫ সালে শেখ নেয়ামত আলী পরিচালিত ‘অন্য জীবন’ চলচ্চিত্রে তিনি শিল্প নির্দেশক হিসেবে কাজ করেন। এই চলচ্চিত্রের শুটিং চলাকালে মহিউদ্দীন ফারুকের নাম

সহকারী শিল্প নির্দেশক হিসেবে উল্লেখ করা হলেও, চিত্রনাট্যকার ও অভিনেতাদের সমর্থনে তাঁর নাম চূড়ান্ত শিল্প নির্দেশক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ঘটনা তাঁর শিল্প নির্দেশনায় নতুন দিগন্তের সূচনা করে।

ভিজুয়াল স্টাইল ও নান্দনিকতা: উত্তম গুহ চলচ্চিত্রের প্রতিটি ফ্রেমকে একটি পেইন্টিং হিসেবে দেখেন। তিনি বলেন, “আমরা যখন ছবি আঁকি, তখন একটা চারকোনা ফ্রেমের ক্যানভাসকে পটভূমি হিসেবে নিই, সেখানে কম্পোজিশন, ফর্ম, স্পেসের সমবন্টন স্টেকচার এবং রং নিয়ে ভেবেচিন্তে ছবিটা আঁকি। ঠিক তেমনি ক্যামেরায় যখন লুক থো করা হয়, তখন একটা চারকোনা ফ্রেমই দেখা যায়। প্রতিটা ফ্রেমকেই একটি পেইন্টিং মনে করে শিল্প নির্দেশনা দিতে হয়।”

সমকালীন চলচ্চিত্রে ভিজুয়াল স্টাইলের প্রবর্তন: উত্তম গুহ সমকালীন বাণিজ্যিক ও আধুনিক ধারার চলচ্চিত্রে ভিজুয়াল স্টাইল প্রবর্তন করেছেন। তিনি চলচ্চিত্রের প্রতিটি ফ্রেমে নান্দনিকতা ও সৃজনশীলতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, যা চলচ্চিত্রের মান উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। শিল্প নির্দেশনায় তার অবদান বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর কাজের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের নান্দনিকতা ও ভিজুয়াল স্টাইলের মান উন্নত হয়েছে, যা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি দৃষ্টান্তরূপ।

শিহাব নূরুন নবী: শিহাব নূরুন নবী বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের একজন প্রখ্যাত শিল্প নির্দেশক। তিনি 'নোনা জলের কাব্য' চলচ্চিত্রের জন্য ২০২১ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক হিসেবে পুরস্কৃত হন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে 'মহানগর', 'তুফান', 'রিকশা গার্ল', 'শনিবার বিকাল', এবং কোক স্টুডিও বাংলার সিজন ২ ও ৩-এর কিছু গান। তিনি প্রায় ৫০০টি টিভিসি, একাধিক চলচ্চিত্র ও ওটিটি প্রকল্পে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, ‘যা কিছু দেখছেন, তার পেছনে শিল্প নির্দেশনার ভূমিকা রয়েছে।’ তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘শিল্প নির্দেশনা এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে সৃজনশীলতা ও বাস্তবতা একত্রিত হয়, এবং এটি চলচ্চিত্রের গল্প কে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।’

কাজের বৈশিষ্ট্য: শিহাব নূরুন নবীর কাজের বিশেষত্ব হলো শিল্পনির্দেশনার জটিলতাকে বাস্তবসম্মত এবং দর্শক প্রিয়ভাবে সাজানো। উদাহরণস্বরূপ, কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় মৌসুমের ‘অবাক ভালোবাসা’ গানের সেটে তিনি সমুদ্রসৈকতের থিম বাস্তবায়ন করেছিলেন, যেখানে সীমিত সময় এবং স্থান সত্ত্বেও দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হন।

এছাড়া সিরাজুল ইসলাম এফডিসির স্থায়ী শিল্প নির্দেশক ছিলেন এবং বিভিন্ন চলচ্চিত্রে কারিগরি দক্ষতা ও স্টুডিও-ভিত্তিক সেট তৈরিতে ভূমিকা রাখেন। খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীর নদী ও নারী (১৯৬৫)-তে শিল্প নির্দেশনা দেন এবং বাস্তবধর্মী আউটডোর লোকেশন এবং মিনিমালিস্টিক সেট ব্যবহার করে আলাদা মাত্রা যুক্ত করেন। বিজয় সেন জোয়ার এলো (১৯৬২)-তে সহকারী শিল্প নির্দেশক হিসেবে কাজ করেন। পরে স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে যান। তরুণ ঘোষ, মো. কলমতর, অনিমেস আইস, মারুফ সামুরাই, হিমাদ্রি বড়ুয়া প্রমুখ সাম্প্রতিক সময়ে কাজ

করছেন। আধুনিক প্রযুক্তি, ডিজিটাল সেট ডিজাইন, থ্রি-ডি মডেলিং ব্যবহার করে সমসাময়িক চলচ্চিত্রে নতুন ধারা আনছেন।

৫.৩. দশক ভিত্তিক শিল্প নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য ও ধারাসমূহের কালক্রম

দশক	চলচ্চিত্র	শিল্প নির্দেশনার ধারা ও মূল বৈশিষ্ট্য
১৯৭১-১৯৮০	ডুমুরের ফুল	• বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি: গ্রামীণ পরিবেশ, ঘরবাড়ি ও খেলনার মাধ্যমে শিশু-কেন্দ্রিক আবেগের বাস্তবতা।• প্রতীকধর্মী উপাদান: ফুল ও প্রকৃতি শিশুকালের কোমলতা ও আবেগের প্রতীক।• আবেগঘন ভিজ্যুয়াল স্টাইল: ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল, লোকেশন ও সেট ডিজাইন আবেগের দৃশ্যায়ন।• সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট: স্বাধীনতার আগে গ্রামীণ জীবন ও সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন।
১৯৮১-১৯৯০	শুভদা	• দরিদ্র পরিবারের বাস্তবতা: ভাঙাচোরা কুঁড়েঘর, জীর্ণ আসবাব ও দেশীয় উপকরণ।• সামাজিক বৈপর্যায়: জমিদারবাড়ির আভিজাত্য বনাম দরিদ্র ঘর।• প্রতীকী মানসিক গভীরতা: দরিদ্র ও ধনী পরিবেশের আলো-ছায়ার বৈপর্যায়।• সাহিত্যিক প্রেক্ষাপট: শরৎচন্দ্রের দারিদ্র্য-চেতনা ও সামাজিক বৈষম্য।
১৯৯১-২০০০	অন্ধ বিশ্বাস	• সামাজিক বৈপর্যায়: উচ্চবিত্ত বনাম মধ্যবিত্তের ভিজ্যুয়াল তুলনা।• রঙ ও টেক্সচার: সোনালী → অর্থ ও অহংকার, নরম প্রাকৃতিক রঙ → মানবিকতা ও প্রেম।• প্রপস ও আলোক-ছায়া: চরিত্রের সামাজিক অবস্থান ও মানসিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ।• বাস্তবতা বনাম কল্পনা: মধ্যবিত্তের বাস্তব চিত্র বনাম উচ্চবিত্তের বিলাসিতা।
২০০১-২০১০	মনের মানুষ	• ঐতিহাসিক পুনর্নির্মাণ: লালনের জীবন অনুযায়ী সেট, পোশাক ও যন্ত্রপাতি।• প্রতীকী উপস্থাপনা: নদী, আখড়ার আঙিনা, চাঁদনি রাত → আধ্যাত্মিকতা ও সমতাবাদী দর্শন।• সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভাষা: জমিদারবাড়ি বনাম আখড়ার সরল জীবন; নারীদের বাউল গান।• নান্দনিক স্তর: খোলা আঙিনা, বাঁশের খুঁটি, ঠাকুরের নৌকা → মানবিক মূল্য।
২০১১-২০২০	গোর	• বাস্তবতা বনাম শিল্প সৃষ্টি: গ্রামীণ জীবন ও চরাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।• সেট ও প্রপস: বাঁশ, ছন, মাটির হাঁড়ি, হারিকেন, চৌকি ইত্যাদি।• প্রাকৃতিক পরিবেশ: দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র গ্রামীণ বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।• রঙ, টেক্সচার ও আলোকসম্পাদন: ধূসর-বাদামি রঙ, ছায়ার ব্যবহার মানসিক বিপর্যয় ও পরিস্থিতি ফুটায়।

দশক	চলচ্চিত্র	শিল্প নির্দেশনার ধারা ও মূল বৈশিষ্ট্য
২০২১- বর্তমান	নোনা জলের কাব্য	- বাস্তববাদী শিল্প নির্দেশনা: চরাঞ্চলের পরিবেশ, নৌকা, ঘরবাড়ি ও চায়ের দোকান। - প্রতীকধর্মী উপাদান: মসজিদ, আখড়া, প্রকৃতি → আধ্যাত্মিকতা ও সামাজিক মর্যাদা। - চরিত্র-নির্ভর শিল্প নির্দেশনা: নায়ক ও সাধারণ চরিত্রের প্রপস সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্দেশ। - নান্দনিক সচেতনতা: প্রাকৃতিক আলো, জানালার দিক ও রঙ-টোনের পরিকল্পনা।

শিল্প নির্দেশনার বর্তমান ধারা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ:

নির্বাচিত চলচ্চিত্রের আধেয় ও গভীর সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত বর্তমান শিল্প নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য ও ধারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাস্তবতা ও নান্দনিকতার সমন্বয়: সিনেমার সেট, প্রপস ও লাকেশনকে বাস্তবধর্মীভাবে উপস্থাপন করা হয়। চরিত্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পোশাক, আসবাবপত্র ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রাকৃতিক আলো, রঙের টোন ও জানালার দিক পরিকল্পনা করে ভিজুয়াল সৌন্দর্য ও বাস্তবতার ভারসাম্য বজায় রাখা হয়।

প্রতীকী ও আবেগঘন উপাদান: চরিত্র ও পরিবেশের মধ্য দিয়ে সামাজিক, আধ্যাত্মিক বা মানসিক দিক প্রতিফলিত করা হয়। প্রকৃতি, নদী, আখড়া, মসজিদ, খোলা আঙিনা ইত্যাদি প্রতীকী ভিজুয়াল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রযুক্তি ও আধুনিক কৌশল: ডিজিটাল প্রযুক্তি, থ্রিডি মডেলিং, ভার্চুয়াল সেট ব্যবহার করে সীমিত বাজেটেও আন্তর্জাতিক মানের ভিজুয়াল তৈরি করা সম্ভব। ব্যাকগ্রাউন্ড প্রজেকশন, রিফ্লেক্টিভ লাইটের মতো নতুন প্রযুক্তি চলচ্চিত্রে বাস্তবতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ব্যবহার করা হয়।

ভিজুয়াল আর্ট হিসেবে ফ্রেম সংরক্ষণ: প্রতিটি ফ্রেমকে একটি ছবি বা পেইন্টিং হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়। কম্পোজিশন, আলো, রঙ ও স্থান ব্যবস্থাপনায় বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়।

সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন: চলচ্চিত্রের সেট ও প্রপস দিয়ে সামাজিক স্তর, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়। দরিদ্র পরিবারের জীবন, উচ্চবিত্তের বিলাসিতা বা গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা সহ দর্শককে ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবেশে অভ্যস্ত করা হয়।

৫.৪. শিল্পনির্দেশনার জন্য ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও উত্তরনের উপায়:

উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে ভিডিও, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলানো কঠিন। মানসম্মত গল্প, নির্মাণশৈলী ও শিল্পমননের অভাব যা দর্শকশূন্যতায় পরিণত হয়। প্রযোজক ও নির্মাতারা ঝুঁকি নিতে অনীহা এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পিছিয়ে থাকা। সেন্সর ও প্রদর্শনের ঝামেলা, যেমন অনুপযোগী সিনেমা হলে মুক্তি পাওয়া দর্শকদের হলবিমুখ করে তোলা। সিনেমা শিক্ষার অভাব ও পেশাদারিত্বের ঘাটতি শিল্পকে সংকীর্ণ করেছে। বড় সেট বা বাস্তবসম্মত প্রপস নির্মাণে প্রচুর অর্থ খরচ হয় যা বাজেট সীমাবদ্ধতার কারণে নিম্নমানে কাজ তৈরি হয় এসব চ্যালেঞ্জ উত্তরনের উপায় হিসেবে যৌথনীতিমালা সহজীকরণ ও প্রযোজকদের আগ্রহী, প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তি গ্রহণ নিশ্চিত করাম, সিনেমার মানোনয়নে বিশেষ অনুদান প্রদান এবং নিয়মিত সমস্যা নিরূপণ ও আলাপ আলোচনা, চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রসার ও বিশ্ববিদ্যালয় ফিল্ম ডিপার্টমেন্টগুলোতে উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা, শিল্পী সমিতি ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো এবং স্বাধীন চলচ্চিত্র কমিশন গঠন, আন্তর্জাতিক উৎসবে অংশগ্রহণ ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানো এবং শিল্প নির্দেশনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

৬. উপসংহার ও সীমাবদ্ধতা

মানবীয় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় ঐতিহাসিক কাল থেকে গণমাধ্যমের ব্যবহার প্রাধান্যযোজ্য। কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে সেই প্রিন্টিং প্রেস (১৪৫০ খ্রি.) থেকে হাল আমলের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহৃত হচ্ছে। গণমাধ্যমের ইতিহাস থেকে জানা যায় ভিজ্যুয়াল মাধ্যম হিসেবে দর্শকদের উপর চলচ্চিত্রের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দর্শকদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা বা দর্শকদের উপর মূখ্য প্রভাব বিস্তারে চলচ্চিত্র ভাষার প্রত্যেক টি উপাদানকে সমভাবে কাজ করতে হয়। যোগাযোগের রহস্য পুরুষ মার্শাল ম্যাকলোহান ১৯৬৪ সালে মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র বা টেলিভিশন তথা ভিজ্যুয়াল মাধ্যমকে কুল (শান্ত) মিডিয়া বলেছেন যেখানে দর্শককে মাধ্যমের আধেয় গ্রহণে একাধিক ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে হয়। মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় চলচ্চিত্রের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের সাথে প্রতিক্রিয়া করে। অর্থাৎ চোখ ভিজ্যুয়াল, কান অডিও উপাদানের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে কার্যকর অর্থ উৎপাদন করে। চলচ্চিত্রের ভিজ্যুয়াল উপাদানের মধ্যে একটি হলো কুলাকুশীদের অভিনয়তব্যের পশ্চাৎপট যা তৈরির কাজ করেন শিল্প নির্দেশকগণ। বলা হয় একটি ভিজ্যুয়াল পরিবেশ বা ছবি হাজার শব্দের সমান। কিন্তু এই ছবির অবয়ব যদি অর্থবহ না হয় তাহলে ছবির বা ভিজ্যুয়াল পরিবেশের কোন মূল্য থাকে না। তাই চলচ্চিত্রে অর্থবহ ভিজ্যুয়াল পরিবেশ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শিল্প নির্দেশনা বিভাগ। বাংলা চলচ্চিত্র আবির্ভাবের ঠিক পরেই চলচ্চিত্রের এই বিভাগের কাজের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শিরানামে গবেষণায় স্বাধীনতার পর ছয় দশকে ৩৭ টি চলচ্চিত্র শিল্প নির্দেশনা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন ১৫ জন ব্যক্তি। বিভিন্ন ঘরনার ছবিতে তাদের কাজের বৈশিষ্ট্য বা ধারা কেমন ছিল, প্রযুক্তির সাথে কীভাবে নিজেদের একীভূত করেছে তা জানার প্রয়োজনীয়তার তাদিগ থেকেই গবেষণা প্রকল্পটি হাতে নেওয়া। সেই গবেষণায় দেখা যায় সাহিত্য ভিত্তিক চিত্রনাট্যে, ঐতিহাসিক ব্যক্তি সম্পর্কিত চিত্রনাট্যে, বাণিজ্যিক ধারার চিত্রনাট্যে, নাট্যধর্মী চিত্রনাট্যে ও পরিবেশ নির্ভর চিত্রনাট্যে শিল্প নির্দেশনার ধারা বা বৈশিষ্ট্য বেশ বৈচিত্রময়। বাস্তবধর্মী, প্রতীকধর্মী, আবেগধর্মী, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভারসাম্যপূর্ণ, বাস্তব-কাল্পনিক মিশ্রণ, পরিবেশ বাস্তবতা,

চরিত্র-নির্ভর, নান্দনিক সচেতনতা, শিল্প সৃষ্টির প্রয়াশ, পরিবেশ বাস্তবতা, ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের শিল্প নির্দেশনা দেখা যায়। অন্যদিকে এসব ধারা নির্মাণে প্রযুক্তির ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। সিজিআই, ত্রিগুপ্তি, রিফ্লেকশন ইত্যাদি ব্যবহার করে শিল্প নির্দেশনার বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে শিল্প নির্দেশনা বিভাগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন হাসান আলী নামের একজন। তার উত্তরসূরি হিসেবে মহিউদ্দিন ফারুক, আব্দুস সবুর, সিরাজুল ইসলাম, চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীর, উত্তম গুহ এবং বর্তমান প্রজন্মের শিহাব নুরগন নবী। তারা শিল্প নির্দেশনায় অনবদ্য অবদান রেখেছেন। বাস্তববাদী, বাস্তব-কল্পনা, স্টুডিও নির্ভর, প্রতীকী, পরিবেশ সচেতনতা এবং নাটকীয় পরিবেশ তৈরিতে কাজ করেছেন বা কাজ করে যাচ্ছেন। শিল্প নির্দেশনার সীমাবদ্ধতার মধ্যে অন্যতম হলো সীমিত বাজেট। অন্যান্যগুলো মধ্যে হলো প্রযুক্তি ব্যবহারে অনভিজ্ঞতা, তথ্যের অপ্রতুলতা, প্রযোজক, পরিচালক, শিল্প নির্দেশকের কার্যকর যোগাযোগের অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক-আর্থিক মর্যাদার অভাব। তবে এসব কাটিয়ে উঠার জন্য সকলে এক সাথে কাজ করতে হবে। আমার গবেষণার বড় সীমাবদ্ধতা ছিল নমুনায়নের অপ্রতুলতা। ছয় দশক থেকে ছয়টি চলচ্চিত্র না নিয়ে আরও তিনগুণ ছবি নিয়ে কাজ করতে পারলে শিল্প নির্দেশনা ধারা বা বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিচিত্র তথ্য পাওয়া যেত। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ দিকের শিল্প নির্দেশকগণের সাক্ষাৎকার নিতে পারলে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার জায়গা সুপ্রসন্ন হতো।

গ্রন্থপুঞ্জ

- রিজু, মাইকেল (২০০৫)। *দি আর্ট ডিরেকশন হ্যান্ডবুক ফর ফিল্ম*, ফোকাল প্রেস, নিউ ইয়র্ক।
- মামুন, বেলায়েত (২০১৮)। *চলচ্চিত্র পাঠ* (সম্পা.), কথা প্রকাশ, ঢাকা।
- আউয়াল, সাজেদুল (২০১৯)। *চলচ্চিত্রচর্যা*, জার্নিয়ান প্রকাশনী, ঢাকা।
- গুপ্ত, ধীমান দাস (২০০৬)। *চলচ্চিত্রে টেকনিক ও টেকনোলজি* (সম্পা.) অবনীন্দ্রনাথ ও বাণী শিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা।
- লোব্রাটো, ভিনসেন্ট (২০০২)। *ফিল্মমেকার্স গাইড টু প্রোডাকশন ডিজাইন*, অলঅর্থ প্রেস, নিউইয়র্ক।
- হায়াত, অনুপম (২০১৮)। *চলচ্চিত্র বিদ্যা*, পলল প্রকাশনী, ঢাকা।
- হোসেন, ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর (২০১৬)। *চলচ্চিত্র অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ* (সম্পা.) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, সংবেদ, ফকিরাপুল ঢাকা।
- রবার্ট ওয়াইন (১৯২০)। *দি ক্যাবিনেট অব ড. ক্যালিগারি*, ফ্যান্টাসি হরর মিস্ট্রি (নির্বাক চলচ্চিত্র), <https://www.youtube.com/watch?v=zV00ylxcwXw> গৃহীত ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪।
- মিউজিক্যাল, ভনসেন্ট মিনেলির এমজিএম (১৯৫১)। এন আমেরিকান ইন প্যারিস <https://www.imdb.com/title/tt0043278/> গৃহীত ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪।
- পাওয়েল ও শেরার (১৯৪৮)। *দি রেড শোস* <https://www.youtube.com/watch?v=AGZFwN2HDQU> গৃহীত ২৫ জানুয়ারি ২০২৫।

- আইজেনস্টাইন (১৯২৫). দি ব্যাটলশীফ পটেমকিন, সাইলেন্ট সিনেমা, <https://www.youtube.com/watch?v=mCR44ihk6C8> গৃহীত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।
- মিকায়েল, এঞ্জেলো (১৯৬৪)। দ্য রেড ডেসার্ট, <https://letterboxd.com/film/red-desert/> গৃহীত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।
- হো, বঙ জো (২০১৯) দি প্যারাসাইট, https://www.rottentomatoes.com/m/parasite_2019, সংগৃহীত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।
- ক্যারেরন, জেমস (২০২২)। দি ওয়ে অব ওয়াটার, <https://www.avatar.com/movies/avatar-the-way-of-water>
- বানশালী (২০১৮), প্যাডমাভাত, <https://tv.apple.com/in/movie/padmaavat/umc.cmc.pvq16y3oyszwdwxmkwmuyx5a> সংগৃহীত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।
- চেজেলি (২০১৬)। লা লা ল্যান্ড <https://tv.apple.com/us/movie/la-la-land/umc.cmc.2ls5rdvvy1t038my1urkcjt94> সংগৃহীত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।
- ক্যারন (২০১৮)। রোমা <https://letterboxd.com/film/roma-2018/> সংগৃহীত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।
- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৭৫-২০২২) <https://moi.portal.gov.bd/> সংগৃহীত ২৮ মে ২০২৫।
- বিএফডিসি, বাংলাদেশে এর তত্ত্বাবধানে নির্মিত বাংলা চলচ্চিত্রের তালিকা (১৯৫৭-২০২৩), <https://fdc.gov.bd/site/page/2238c061-8480-4a79-bee0-13c880a5fa57/-> সংগৃহীত ২০ মে ২০২৫।
- খান ও সাগর (২০১০), মনের মানুষ, <https://www.youtube.com/watch?v=P7ZHdbbSQ-0> সংগৃহীত ২৯ মে ২০২৫।
- ওয়াহিদ, সাদিক (১৯৯২) অন্ধ বিশ্বাস, <https://www.youtube.com/watch?v=cvtn5sSI-qc&t=5431s> সংগৃহীত ২২ মে ২০২৫।
- খান, জাহাঙ্গীর (১৯৮৬), শুভদা <https://www.youtube.com/watch?v=nKxrnQNjbiI&t=2251s> সংগৃহীত ২৫ মে ২০২৫।
- দত্ত, সুভাষ (১৯৭৮), ডুমুরের ফুল, https://www.youtube.com/watch?v=nL-XF_ILu_U&t=5802s সংগৃহীত ২৬ মে ২০২৫।
-
- গ্রিড, আইআইনান (২০২১), নোনা জলের কাব্য, <https://www.youtube.com/watch?v=713TgURUEyM> সংগৃহীত ১৫ মে ২০২৫।

- সাগর, ফরিদুর রেজা (২০২০), গোর, <https://watch.plex.tv/watch/movie/the-grave-2020?uri=provider%3A%2F%2Ftv.plex.provider.vod%2Flibrary%2Fmetadata%2F6081361ed666f400368f5632> সংগৃহীত ৩০ মে ২০২৫।
- হাসান, মীর রাকিব (২০১৮, ২৯ নভে), তিনি উত্তম, কালের কণ্ঠ, <https://www.kalerkantho.com/feature/ronger-mela/2018/11/29/708654>
- দেশ রূপান্তর, (২০২৩, ১৯ মার্চ), সেরা শিল্প নির্দেশক শিহাবের অভিজ্ঞতা, <https://www.deshrupantor.com/415016/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%A4%E0%A6%BE>